অতি গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় প্রশ্নোত্তর

سؤال وجواب في أهم المهمات

<বাঙালি - Bengal - بنغالي >

আল্লামা শাইখ আব্দুর রহমান ইবন নাসির ইবন সা‘দী আত-তামীমী আন-নাজদী আল-হাম্বলী

তাহকীক ও তাখরীজ

আব্দুস সালাম ইবন বেরজিস ইবন নাসির আলে আব্দুল কারীম

৪০৩৪

অনুবাদক: আব্দুল্লাহ আল মামুন আল-আযহারী

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

سؤال وجواب في أهم المهمات

العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن
سعدي التميمي النجدي الحنبلي

اعتني بنشرها وتحقيقها وتخريج أحاديثها
عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم

ترجمة: عبد الله المأمون الأزهري

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচিপত্র

১৯.	বিংশতম প্রশ্ন: ইমাম তথা উম্মতের ইমাম থাকার ব্যাপারে আপনার মতামত কী?	
২০.	একবিংশতম প্রশ্ন: সিরাতুল মুস্তাকীম কী? এর বৈশিষ্ট্য কী কী?	
২১.	দ্বাবিংশতম প্রশ্ন: কী কী গুণের কারণে মুসলিম ব্যক্তি কাফির ও নাস্তিক থেকে আলাদা হবে?	
২২.	প্রশ্ন: সহীহ ঈমানের কারণেই মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-সৌভাগ্য লাভ করে। তাহলে অধিকাংশ মানুষ কেন দীন ও ঈমান থেকে বিমূখ?	
২৩.	প্রশ্ন: এক ব্যক্তি বৃহৎ দীনের (ইসলামের) মূলনীতি সংক্ষেপে জানতে প্রশ্ন করেছেন।	
২৪.	প্রশ্ন: ইবাদতের হাকীকত ও সারাংশ সর্বোচ্চ ভালোবাসা ও সর্বোচ্চ বিনয়ী হওয়া। উপরোক্ত দু'টি উসূলের ভিত্তিতে সৃষ্টিকুলের সাথে সম্পৃক্ত ভালোবাসা ও বিনয় যা ইবাদাতের স্তরে পৌঁছে না ও ইবাদাতের হাকীকতের মধ্যে পার্থক্য কী?	

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সে মহান আল্লাহ তা'আলার যার রয়েছে সুন্দর নামসমূহ, পরিপূর্ণ গুণাবলী ও অফুরন্ত নি'আমতরাজি। দুরূদ ও সালাম পেশ করছি দীন, দুনিয়া ও আখিরাতের সংস্কারের নিমিত্তে প্রেরিত নবী মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

অতঃপর, এটি একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। এতে দীনের সে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি ও ঈমানের উসূলসমূহ আলোচনা করা হয়েছে যা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয়। এগুলোকে আমি প্রশ্নোত্তর আকারে সাজিয়েছি, যাতে পাঠকের বুঝতে ও অনুধাবন করতে সহজ হয়। এ গুলোকে আমি শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছি।

প্রথম প্রশ্ন: তাওহীদের সংজ্ঞা কী? তাওহীদ কত প্রকার?

উত্তর: তাওহীদের সব প্রকারের সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা হলো: পরিপূর্ণ গুণের সমন্বয়ে রবের একত্বতা সম্পর্কে বান্দার জ্ঞান, বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও ঈমান এবং এতে রবকে একক হিসেবে মানা, এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁর পূর্ণতায় কোনো উপমা নেই, তিনি সমস্ত বান্দার জন্য ইলাহ ও মা'বুদ (ইবাদতের একমাত্র যোগ্য), অতঃপর সব ধরণের ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাঁকে একক রাখা (কাউকে শরীক না করা)।

তাহলে উপরোক্ত সংজ্ঞায় তাওহীদের তিন প্রকারই শামিল করেছে। তা হলো:

প্রথমত: তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত: রবকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, পরিচালনাকারী ও লালন পালনকারী হিসেবে স্বীকার করা।

দ্বিতীয়ত: তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত: আল্লাহ নিজের জন্য যেসব নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন বা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য যেসব নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন এবং কোনো সাদৃশ্য ও উপমা ব্যতীত, বিকৃতি ও পরিবর্তন ব্যতিরেকে যেসব গুণাবলী এগুলোর ওপর প্রমাণ করে সে গুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা।

তৃতীয়ত: তাওহীদুল ইবাদাত: সব ধরণের ইবাদাতের জন্য আল্লাহকে এক ও একক করা এবং তাঁর সাথে শির্ক না করে ইবাদতে একনিষ্ঠ থাকা। অতঃএব, তাওহীদের উপরোক্ত প্রকারসমূহ সম্পূর্ণরূপে ধারণ না করলে ও এ গুলোকে প্রতিষ্ঠা না করলে বান্দা মুয়াহহিদ তথা একত্ববাদী হতে পারবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: ঈমান ও ইসলাম কী? এ দু’টির সাধারণ মূলনীতি কী?

উত্তর: ঈমান হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু আদেশ করেছেন সেগুলোর ওপর দৃঢ় ঈমান স্থাপন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করাকে বলে ইসলাম। একমাত্র আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণ করা ও তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করাকে ইসলাম বলে।

ঈমান ও ইসলামের সাধারণ মূলনীতি নিম্নোক্ত আয়াতে একত্রিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٦﴾ [البقرة: ١٣٦]

“তোমরা বল, ‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের ওপর ও যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের সন্তানদের ওপর, আর যা প্রদান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা প্রদান করা হয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে নবীগণকে।

আমরা তাদের কারো মধ্যে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৩৬]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে জিবরীলে ও অন্যান্য হাদীসে ঈমান ও ইসলামের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

«الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ والْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ».

“ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনবে, আর তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান রাখবে। ইসলাম হলো, তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানের সাওম পালন করবে এবং বাইতুল্লাহর হজ পালন করবে।”[1]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানকে অন্তরের বিশ্বাস ও ইসলামকে শরী‘আতের বাহ্যিক আমলের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন।

তৃতীয় প্রশ্ন: আল্লাহর নামসমূহ ও সিফাতের সাথে ঈমানের আরকান কী কী?

উত্তর: আসমাউল হুসনা তথা আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের প্রতি ঈমান, এসব নামসমূহ থেকে নির্গত সিফাত তথা গুণসমূহের প্রতি ঈমান ও এসব নামের সিফাতের আহকাম ও এর সম্পৃক্ততার প্রতি ঈমান আনা। অতএব, আমরা

[1] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১/৩৬, হাদীস নং ৮, উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত; সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, ১/২৭, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১/৩৯, হাদীস নং ৯, উভয়ে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

ঈমান আনব যে, আল্লাহ আলীম তথা মহাজ্ঞানী, সব কিছুর ওপর তাঁর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রয়েছে। তিনি কাদীর তথা সর্বশক্তিমান, তিনি মহাশক্তির অধিকারী, সব কিছুর ওপর তাঁর শক্তি রয়েছে। আবার তিনি রাহীম তথা পরম দয়ালু, দয়াবান, প্রশস্ত দয়ার অধিকারী, যাকে ইচ্ছা তিনি দয়া করেন। এভাবে বাকী আসমাউল হুসনা তথা আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ, সিফাতসমূহ ও এর থেকে নির্গত গুণসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

চতুর্থ প্রশ্ন: আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে এবং তিনি 'আরশে উপবিষ্ট এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর: আমরা জানি আমাদের রব মহান আল্লাহ সবদিক থেকে ঊর্ধ্বে ও উপরে। স্বত্বাগত দিক থেকে তিনি সবার ঊর্ধ্বে। ক্ষমতা ও গুণের দিক থেকেও সবার ঊর্ধ্বে। তিনি শক্তি ও পরাক্রমশালিতায়ও সবার ঊর্ধ্বে। তিনি সৃষ্টিকুল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি আমাদেরকে যেভাবে বলেছেন সেভাবে তিনি 'আরশে উপবিষ্ট আছেন। তাঁর উপবিষ্টটা আমাদের জ্ঞাত, কিন্তু উপবিষ্টের ধরণ আমাদের অজ্ঞাত। তিনি কুরআনে আমাদেরকে বলেছেন, তিনি 'আরশে উপবিষ্ট, তবে কীভাবে উপবিষ্ট তা আমাদেরকে বলেন নি। এভাবেই আমরা আল্লাহর অন্যান্য সিফাতের ব্যাপারে বলব যে, তিনি সেগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, তবে সেগুলোর ধরণ সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি। অতএব, আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ তাঁর কিতাবে এবং তাঁর নবী মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে যা বলেছেন সেগুলোর প্রতি যেভাবে এসেছে সেভাবেই ঈমান আনব এবং এ সম্পর্কে বেশি বা কম কিছু করব না।

পঞ্চম প্রশ্ন: দুনিয়ার আসমানে (প্রথম আসমানে) আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং তিনি নিজে আসেন এ সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

উত্তর: আল্লাহ নিজের জন্য যেসব গুণ যেমন রহমত, সন্তুষ্টি, জমিনে অবতরণ করা, আগমন করা ইত্যাদি যা বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে যেসব গুণ বর্ণনা করেছেন যা সৃষ্টির সাথে কোনো উপমা ও সদৃশ হয় না সেগুলোর প্রতি আমরা ঈমান আনি ও দৃঢ় বিশ্বাস করি। তাঁর অনুরূপ কিছু নেই। আল্লাহর যাতের অনুরূপ কোনো যাত নেই। এমনিভাবে আল্লাহর সিফাত আছে যা অন্যের সিফাতের (গুণের) সদৃশ নয়। একথার প্রমাণ হলো, কুরআন ও হাদীসে যেসব গুণের বিস্তারিত বর্ণনা আছে, আল্লাহর যেসব গুণের প্রশংসা রয়েছে এবং যেসব গুণ সাধারণভাবে তাঁর সদৃশ, সমকক্ষ, সমতা ও অংশীদার মুক্ত সেগুলো সাব্যস্ত করা।

ষষ্ঠ প্রশ্ন: আল্লাহর কালাম ও কুরআনের ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর: আমরা বলব, আল-কুরআন আল্লাহর কালাম, এটি তাঁর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, এটি তাঁর সৃষ্টি নয় এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। এর শব্দ ও অর্থ স্বয়ং আল্লাহই কথা বলেছেন, তবে কুরআন আযালী (সর্বদা বিদ্যমান ছিলো এমন) নয়। আল্লাহর যখন ইচ্ছা তখন কথা বলেন ও বলবেন, তাঁর কথা নিঃশেষ হবার নয় এবং এর শেষ সীমাও নেই।

সপ্তম প্রশ্ন: সাধারণভাবে ঈমান কী? ঈমান কি বাড়ে কমে?

উত্তর: অন্তরের বিশ্বাসসমূহ ও কাজ, তদনুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম সম্পাদন এবং জিহ্বা তথা জবানের স্বীকৃতিকে ঈমান বলে। অতএব, দীনের উসূল ও ফুরু' (মৌলিক নীতি ও শাখা-প্রশাখা) সব কিছুই ঈমানের মধ্যে শামিল। ফলে বিশ্বাসের শক্তি, ভালো আমল ও উত্তম কথাবার্তার কম-বেশির কারণে ঈমান বাড়ে ও কমে।

অষ্টম প্রশ্ন: সম্পূর্ণ ফাসিকের হুকুম কী?

উত্তর: যে ব্যক্তি মুমিন ও তাওহীদে বিশ্বাসী কিন্তু বারবার গুনাহের কাজ করে সে ব্যক্তি মুমিন, যেহেতু তার ঈমান আছে, তবে সে ফাসিক। কেননা সে ঈমানের চাহিদা পূরণ করে নি, সে ব্যক্তি অপূর্ণাঙ্গ ঈমানদার। এ ধরণের লোকেরা ঈমানের কারণে আল্লাহর ওয়াদাকৃত নি'আমতের অধিকারী হওয়ার যোগ্য আবার পাপের কারণে আল্লাহর শাস্তিরও প্রাপ্য। এতদসত্বেও সে ব্যক্তি জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। কেননা সাধারণত পূর্ণ ঈমান থাকলেই তা জাহান্নামে প্রবেশ করতে বারণ করে আর অপূর্ণ ঈমান হলে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হতে বারণ করে।

নবম প্রশ্ন: মুমিনদের স্তর কয়টি ও কী কী?

উত্তর: মুমিনগণ তিন প্রকারের। একদল হলো সাবিকূনা ইলাল খাইরাত তথা কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। তারা হলো সেসব লোক যারা ফরয ও মুস্তাহাব যথাযথভাবে পালন করে এবং হারাম ও মাকরূহ থেকে বিরত থাকে। দ্বিতীয় দল হলো মুকতাসিদূন তথা মধ্যপন্থী। তারা হলো সেসব লোক যারা ফরয কাজসমূহ আদায় করেছেন আর হারাম বর্জন করেছেন। আর তৃতীয় দল হলো

যালিমূনা লিআনফুসিহিম তথা নিজেদের ওপর যুলুমকারী। তারা সেসব লোক যারা ভালো ও মন্দ উভয় ধরণের কাজ করেছেন।

দশম প্রশ্ন: বান্দার কাজসমূহের হুকুম কী?

উত্তর: বান্দার ভালো-মন্দ সব কাজই আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরই ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় সম্পন্ন হয়ে থাকে; তবে বান্দা নিজেই এসব কাজের কর্তা। আল্লাহ কাউকে জবরদস্তি করেন না; যদিও সব কাজ তাঁরই ইচ্ছা ও শক্তিতে সংঘটিত হয়ে থাকে। এসব কাজ মূলত বান্দার নিজেরই কর্ম। তারা এসব কাজের দ্বারা নিজেরাই প্রশংসিত বা নিন্দিত হয়, ভালো কাজে পুরস্কৃত হয় আর মন্দ কাজে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। বান্দার কাজসমূহ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সৃষ্টি। কেননা আল্লাহ এসব কাজ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তাদেরকে এসব কাজ করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য প্রদান করেছেন। অতএব, এভাবেই যা কিছুই সংঘটিত হয় সেগুলো সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহের দলীল অনুযায়ী আমরা বিশ্বাস করি এসব কিছু আল্লাহর সৃষ্টি ও ব্যক্তি, গুণাবলী ও কাজ সব কিছুর ওপরই তাঁর কুদরত রয়েছে। এমনিভাবে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, ভালো-মন্দ কাজের মূল কর্তা বান্দা নিজেই। তারা তাদের কাজের ব্যাপারে স্বাধীন। তারা তাদের পছন্দানুযায়ী ভালো বা মন্দ যে কোনো কাজ করতে পারে। আল্লাহ শুধু তাদের সামর্থ্য ও ইচ্ছাশক্তির স্রষ্টা। আর এ দুটো (সামর্থ্য ও ইচ্ছাশক্তি) তাদের কাজ ও কথাবার্তা সংঘটিত হওয়ার উপায় মাত্র। আর বস্তুর পূর্ণ উপকরণ সৃষ্টিকারীই বস্তুটির (মুসাববাবের) স্রষ্টা। আল্লাহ তাদেরকে কাজ করানোর জন্য জবরদস্তি করা থেকে পুত:পবিত্র, সুমহান ও সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ।

একাদশতম প্রশ্ন: শির্ক কী? শির্কের প্রকারভেদ কী কী?

উত্তর: রুবুবিয়্যাতের[1] মধ্যে শির্ক দুই প্রকার। তা হলো: বান্দার এ বিশ্বাস যে, কিছু সৃষ্টি বা কিছু পরিচালনার মধ্যে আল্লাহর সাথে কেউ শরীক আছেন। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, ইবাদাতের মধ্যে শির্ক করা। এটা আবার দু ধরণের। বড় শির্ক ও ছোট শির্ক। বড় শির্ক হলো যে কোনো ধরণের ইবাদাত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা। যেমন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা বা কারো কাছে কিছু আশা করা বা কাউকে ভয় করা ইত্যাদি। এ ধরণের লোক দীনের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে এবং জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। আর ছোট শির্ক হলো, যে কাজগুলো মানুষকে বড় শির্কের দিকে নিয়ে যায়। যেমন, আল্লাহ ছাড়া কারো নামে শপথ করা ও লোক দেখানো উদ্দেশ্যে ইবাদাত করা ইত্যাদি।

দ্বাদশতম প্রশ্ন: আল্লাহর প্রতি ঈমানের বিস্তারিত বিবরণ কী?

উত্তর: আমরা অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি দ্বারা স্বীকার করি যে, আল্লাহ ওয়াজিবুল উজূদ তথা সর্বদা তাঁর অস্তিত্ব থাকা অত্যাবশ্যকীয়, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সব পূর্ণ গুণাবলীতে, মর্যাদায়, বড়ত্বে, অহংকারে, শ্রেষ্ঠত্বে তিনি একক ও অদ্বিতীয়। সব গুণাবলীতে তাঁর রয়েছে পরিপূর্ণ পূর্ণতা যেখানে সৃষ্টিকুলের পক্ষে পৌঁছা অসম্ভব। তিনিই প্রথম, তাঁর আগে কিছু নেই, তিনিই শেষ, তাঁর পরে আর কিছু থাকবে না, তিনিই যাহির তথা সদাভাস্বর, দৃশ্যমান, তাঁর চেয়ে কোনো কিছুই স্পষ্ট নেই, তিনিই বাতিন তথা সবচেয়ে নিগূঢ় সত্তা, তাঁর চেয়ে কোনো কিছুই নিগূঢ় নেই। তিনি সর্বোচ্চ, সুউচ্চ, উচ্চ সত্তা, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন, উচ্চ পরাক্রমশালী, তিনি সব কিছু সম্পর্কে মহাজ্ঞানী, সব কিছু জানেন, সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান,

---

[1] আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, পরিচালনাকারী ও লালনপালনকারী হিসেবে স্বীকার করাকে রুবুবিয়্যাত বলে। -অনুবাদক।

সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রোতা, ভাষার ভিন্নতা ও প্রয়োজনের নানা ধরণ সত্বেও সব কিছুর আওয়াজ শুনতে পান, তিনি সর্বদ্রষ্টা, সব কিছু দেখতে পান, তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান, সৃষ্টি ও আইন প্রদানে মহাবিজ্ঞ, তিনি গুণে ও কর্মে সর্বপ্রশংসিত, তিনি মহিমায় ও বড়ত্বে মহাগৌরাবিত, তিনি দয়াবান, দয়ালু, তাঁর রহমত সব কিছুর উপর বিস্তৃত ও সকলেই তাঁর অনুগ্রহ ও দানপ্রাপ্ত, তিনি রাজাধিরাজ, সব রাজা ও রাজ্যের মালিক, তাঁর রয়েছে একচ্ছত্র মালিকানা, উর্ধ্বজগত ও নিম্নজগত সব কিছুই তার মালিকানাধীন ও তাঁর গোলাম, তাঁর রয়েছে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপ, তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর রয়েছে সব যাতী গুণাবলী সম্পন্ন পরিপূর্ণ জীবন, তিনি স্বয়ংস্থিতিশীল ও অবিনশ্বর, তিনি নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যকেও প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি সব ধরণের কর্ম সম্পাদনকারী, তিনি যা ইচ্ছা তাই সম্পন্ন করেন, তিনি যা চান তা-ই সংঘটিত হয়, আর তিনি যা চান না তা সম্পন্ন হয় না, আমরা সাক্ষ্য দেই যে, তিনি আমাদের রব, সৃষ্টিকারী, উন্মেষকারী, রূপ দানকারী, যিনি সমস্ত সৃষ্টি সৃজন করেছেন, সৃষ্টিতে তিনি সুচারুতা ও দক্ষতা দেখিয়েছেন এবং উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এমন আল্লাহ যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একমাত্র উপাস্য, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য নয়। অতএব, তিনি ব্যতীত কারো সম্মুখে শির নত করি না, একমাত্র মহাশক্তিশালী, মহাপরাক্রান্ত, মহাক্ষমাশীল আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে মাথা অবনত করি না, কিছু প্রার্থনা করি না, আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করি এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাই, তাঁর কাছে প্রত্যাশা করি, তাঁকেই ভয় করি, তাঁর রহমত আশা করি, তাঁর আযাবকে ভয় করি, তিনি ব্যতীত আমাদের কোনো রব নেই। অতএব, তাঁরই কাছে আমাদের প্রার্থনা এবং তাঁকেই আমরা ডাকি। তিনি ব্যতীত আমাদের এমন কোনো ইলাহ নেই যার কাছে আমরা আশা করতে পারি। আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সংশোধনে তিনিই আমাদের একমাত্র অভিভাবক। তিনি উত্তম

সাহায্যকারী এবং সমস্ত বিপদাপদ ও অকল্যাণ থেকে তিনিই একমাত্র প্রতিরোধকারী ও রক্ষাকারী।

ত্রয়োদশতম প্রশ্ন: নবীদের প্রতি ঈমানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কী ধরণের?

উত্তর: সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে যেসব নবীদের নবুওয়ত ও রিসালাত সাব্যস্ত হয়েছে সে সব নবীদের প্রতি আমরা ঈমান আনয়ন করি এবং বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ অহী ও রিসালাতের মাধ্যমে তাদেরকে নির্বাচিত করেছেন এবং তাঁর নিজের ও সৃষ্টির মাঝে তাঁর দীন ও শরী'আত পৌঁছানোর জন্য তাদেরকে মাধ্যম হিসেবে নিয়োজিত করেছেন। তাদের আনিত বিষয়ের সত্যায়ন ও সঠিকতা প্রমাণের জন্য তিনি তাদেরকে মু'জিযা দিয়ে সাহায্য করেছেন। তারা জ্ঞান-গরিমা ও আমলের দিক থেকে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ সৃষ্টি, তারা সর্বাধিক সত্যবাদী, সবচেয়ে সৎ ব্যক্তি ও সর্বোচ্চ সচ্চরিত্রবান। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন সৎ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে নির্বাচিত করেছেন যা অন্যদের স্পর্শ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাদেরকে সমস্ত অসচ্চরিত্র থেকে পবিত্র রেখেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা যে দাওয়াত পৌঁছেছেন সে ব্যাপারে মাসূম তথা নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। তারা তাদের দাওয়াত ও তাবলীগে সত্য ও সঠিকটাই প্রচার করেছেন। তাদের সকলের প্রতি ও তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন সেগুলোর ওপর ঈমান আনা, তাদেরকে ভালোবাসা, সম্মান করা ও মর্যাদা প্রদান করা ফরয। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, এসব কাজ আমাদের নবী মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে করা (তার প্রতি ও তার আনিত সব কিছুর ওপর ঈমান আনা, তাকে সম্মান করা ইত্যাদি) আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয। তাকে জানা, সাধ্যানুসারে তার আনিত শরী'আত সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে জানা, এসবের প্রতি ঈমান আনা ও সর্বদা অটুট থাকা ফরয। তার আনিত সকল বিষয়ে

আনুগত্য করা, তার আদেশ মান্য করা ও নিষেধ থেকে বিরত থাকাও ফরয। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন তথা সর্বশেষ নবী, তার পরে আর কোনো নবী আসবেন না, তার শরী'আত পূর্বের সব শরী'আতকে রহিত করে দিয়েছে, তার শরী'আত কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। বান্দার ঈমান ততক্ষণ পূর্ণ হবে না যতক্ষণ সে বিশ্বাস করবে যে, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত সব কিছুই সত্য। আক্বলী (বিবেকপ্রসূ), ইন্দ্রিয় ও সব ধরণের দলীল প্রমাণ তার আনিত সত্যের বিপরীত প্রমাণ করতে পারবে না; বরং সঠিক বিবেক ও বাস্তব দৃশ্যমান বিষয়াদি তার সত্যতা ও সঠিকতার সাক্ষ্য প্রদান করে।

চতুর্দশতম প্রশ্ন: কাদ্বা ও কাদর তথা তাকদীরের প্রতি ঈমানের স্তর কয়টি ও কী কী?

উত্তর: তাকদীরের প্রতি ঈমানের স্তর চারটি। এ চারটি স্তরের সব কয়টির ওপর ঈমান না আনলে তার ঈমান পূর্ণ হবে না। সেগুলো হচ্ছে: আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে মহাজ্ঞানী একথার ওপর ঈমান আনা, তার ইলম সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট সব কিছু সম্পর্কে সর্বব্যাপী, তিনি এসব কিছু লাওহি মাহফূযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং সব কিছু তাঁর ইচ্ছা ও কুদরতে সংঘটিত হয়ে থাকে, তিনি যা ইচ্ছা করেন তা সংঘটিত হয়, আর তিনি যা চান না তা কখনও হয় না, এতদসত্বেও তিনি বান্দাকে কাজ করতে সক্ষমতা ও ইখতিয়ার দিয়েছেন, ফলে তারা তাদের পছন্দানুযায়ী ও ইচ্ছানুসারেই কাজ করে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍ﴾ [الحج: ٧٠]

"তুমি কি জান না যে, আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তা জানেন? নিশ্চয় তা একটি কিতাবে রয়েছে।" [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৭০]

﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ ٢٨ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٩﴾ [التكوير: ٢٨، ٢٩]

“যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য। আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন”। [সূরা আত-তাকওয়ীর, আয়াত: ২৮-২৯]

পঞ্চদশতম প্রশ্ন: আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান বলতে কী বুঝায়? কোন কোন বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত করে?

উত্তর: মৃত্যুর পরের জিন্দেগী সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহে যা কিছু এসেছে তা সব কিছুই আখিরাতের দিবসের প্রতি ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কবরের অবস্থা, বারযাখ, কবরে নি‘আমত ও শাস্তি, কিয়ামতের দিনের অবস্থা, এ দিনের হিসাব-নিকাশ, সাওয়াব, শাস্তি, সুহুফ, মীযান, শাফা‘আত, জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থা ও এর বর্ণনা, জান্নাতী ও জাহান্নামীদের অবস্থা, আল্লাহ এ দুয়ের অধিবাসীদের জন্য যা তৈরি করে রেখেছেন এগুলোর প্রতি সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে ঈমান আনয়ন করা আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনা বলে।

ষষ্ঠাদশতম প্রশ্ন: নিফাক কী? এর প্রকার ও আলামত কী কী?

উত্তর: ভালো প্রকাশ করা আর ভিতরে মন্দ গোপন রাখাকে নিফাক বলে। নিফাক দু’প্রকার। বড় নিফাক, আর তা হলো বিশ্বাসে নিফাক। এ ধরণের মুনাফিক চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। এ প্রকারের মুনাফিকের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ٨﴾ [البقرة: ٨]

“আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি’, অথচ তারা মুমিন নয়।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৮]

এরা অন্তরে কুফুরী পোষণ করে আর মুখে ইসলাম প্রকাশ করে।

আর দ্বিতীয় প্রকার নিফাক হলো ছোট নিফাক, আর তা হলো মানুষের কাজে কর্মের নিফাক। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের সম্পর্কে বলেছেন,

«آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

“মুনাফিকের আলামত তিনটি: যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে।”[1]

অতএব, বড় কুফুরী ও বড় নিফাকী ঈমান ও আমলের কোন উপকারে আসবে না। তবে ছোট কুফুরী ও ছোট নিফাকী ঈমানের সাথে একত্রিত হতে পারে, এ ক্ষেত্রে বান্দার মধ্যে ভালো-মন্দ দুটোই থাকবে এবং ভালো কাজের বিনিময়ে সাওয়াব পাবে আর মন্দ কাজের কারণে শাস্তি ভোগ করবে।

সপ্তদশতম প্রশ্ন: বিদ‘আত কী? বিদ‘আত কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর: বিদ‘আত হলো সুন্নাতের বিপরীত কাজ। এটি দু’প্রকার। বিশ্বাসে বিদ‘আত। আর তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা বলেছেন তার বিপরীত বিশ্বাস স্থাপন করা। এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসে উল্লেখ হয়েছে,

[1] সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, ১/৮৯, ৫/২৮৯, ৩৭৫, ১০/৫০৭, হাদীস নং ৩৩, ২৬৮২, ২৭৪৯, ৬০৯৫; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১/৭৮, হাদীস নং ৫৯। বুখারী ও মুসলিম উভয়েই হাদীসটি আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

«وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فرقةً كُلُّها فِي النَّارِ إلا وَاحِدَةً ، قَالُوا: ما هي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هُوَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي».

“আর আমার উম্মতেরা তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এদের একটি দল ছাড়া সব দলই হবে জাহান্নামী। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কোন দল? তিনি বললেন: আজ আমি এবং আমার সাহাবীরা যার ওপর প্রতিষ্ঠিত।”[1]

---

[1] মুসনাদ আহমাদ, ২/৩৩২; আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, ৫/৪, হাদীস নং ৪৫৯৭; তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, ৫/২৫, হাদীস নং ২৬৪১; ইবন মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, ২/১৩২১, হাদীস নং ৩৯৯২; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৬৭৩১; আল-আজুরী তার শরী'আহতে, পৃষ্ঠা নং ১৫; মুহাম্মাদ ইবন নসর তার সুন্নাহতে, পৃষ্ঠা নং ১৭-১৮; হাকিম তার মুসতাদরাকে, ১/৬ ও ১/১২৮; আল-ইসফিরায়ী তার ফিরাক বাইনাল ফিরাক, পৃষ্ঠা নং ৪ ও ৫; তারা সকলে মুহাম্মাদ ইবন ‘আমর ইবন ‘আলকামা ইবন ওয়াককাস আল-লাইসী থেকে, তিনি আবু সালমা ইবন আব্দুর রহমান থেকে, তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তবে তাদের বর্ণনায় নিম্নোক্ত শব্দাবলী নেই।

«كُلُّها فِي النَّارِ إلا وَاحِدَةً ، .... هُوَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي».

হাদীসের সনদটি হাসান। সনদের সবাই সিকাহ, শুধু মুহাম্মাদ ইবন ‘আমর ইবন ‘আলকামা ব্যতীত। ইমাম যাহাবী রহ. মিযানে ৩/৬৭৩ বলেছেন: তিনি বিখ্যাত শাইখ, হাসানুল হাদীস, আবু সালমা ইবন আব্দুর রহমান থেকে অধিক বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী তার হাদীস মুতাবা‘আ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম হাকিম ও ইবন হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এ হাদীসটি সাহাবীদের থেকে একদল বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। দেখুন, মাকাসিদুল হাসানাহ, সাখখাভী, পৃষ্ঠা, ১৫৮; নুযুমুল মুতানাসিরাহ মিনাল হাদীসিল মুতাওয়াতিরাহ, কাত্তানী, পৃষ্ঠা, ৩২-৩৪।

অন্যদিকে হাদীসে অতিরিক্ত:

«كُلُّها فِي النَّارِ إلا وَاحِدَةً وهي الجماعة».

এ অংশটুকু মুসনাদে আহমাদে (৪/১০২) মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে

অতএব, যে ব্যক্তি হাদীসে বর্ণিত গুণাবলী অনুযায়ী হবে সে ব্যক্তি শুধু সুন্নাহর অনুসারী, আর যে সুন্নাহর অনুসারী হবে না সে বিদ‘আতী। আর সব বিদ‘আতই গোমরাহী। তবে সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়ার দূরত্ব অনুসারে বিদ‘আতের স্তরও কম বেশি হয়।

দ্বিতীয় প্রকার বিদ‘আত হলো আমলী তথা কাজে-কর্মে বিদ‘আত। আর তা হলো শরী‘আত প্রণেতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব ইবাদত করতে আদেশ করেছেন তা ব্যতীত অন্যসব ইবাদাত করা বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেগুলো হারাম করেছেন সেগুলো হালাল করা।

এসেছে। এ ছাড়াও এ অংশটুকু আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, ৫/৫; আযুরুমীর শরী‘আহ, পৃষ্ঠা ১৮; হাকিমের মুসতাদরাক, ১/১২৮; ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ আছে। ইমাম হাকিম এ হাদীসটি বর্ণনার পরে বলেছেন, ‘হাদীসের এ সনদগুলো এ হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ, এ মত ইমাম যাহাবী রহ.ও স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম শাতেবী রহ. আল-ই‘তিসামে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

মুসনাদে আহমাদে (৩/১২০) আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এ অতিরিক্ত অংশটুকু বর্ণিত আছে; আজুরীর আশ-শারী‘আহর পৃষ্ঠা ১৬-১৭ তেও বর্ণিত আছে।

এ ছাড়াও আজুরীর আশ-শারী‘আহর পৃষ্ঠা ১৭-১৮ তে সা‘দ ইবন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে।

অন্যদিকে হাদীসের আরেক অতিরিক্ত অংশ,

«كُلُّها فِي النَّارِ إلا وَاحِدَةً، .... هُوَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي».

আজুরীর আশ-শরী‘আহর পৃষ্ঠা ১৫-১৬ তে আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তাবরানী রহ. মু‘জামুস সাগীরে (১/২৫৬) আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

অতএব, যে ব্যক্তি শরী‘আত বহির্ভূত কোনো ইবাদাত করল বা শরী‘আত যা হারাম করে নি তা হারাম করল সে বিদ‘আত করল।

অষ্টাদশতম প্রশ্ন: আপনার ওপর মুসলিমের হক (দায়িত্ব-কর্তব্য) কী?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]

“নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।” [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১০]

এক মুসলিম অপর মুসলিমকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করা ওয়াজিব। সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করবে এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ করবে অন্যের জন্যও তা অপছন্দ করবে। সাধ্যমত তাদের জন্য কল্যাণকর কিছু করা, পরস্পর সংশোধনের চেষ্টা করা, নিজেদের মাঝে ভালোবাসা বন্ধন সৃষ্টি করা ও তাদেরকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠা রাখতে প্রচেষ্টা করা। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সুতরাং সে তার ওপর যুলুম করবে না, তাকে অপমান করবে না, তার ব্যাপারে মিথ্যা বলবে না, তাকে হেয় করবে না। যাদের ওপর তার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তাদের হক আদায় করবে। যেমন, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও অধীনস্থ কর্মচারীদের অধিকার আদায় করবে।

ঊনবিংশতম প্রশ্ন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

উত্তর: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণাঙ্গ ঈমান ও ভালোবাসার অন্যতম অংশ হলো তার সাহাবীগণকে তাদের মর্যাদা ও ইসলাম গ্রহণের অগ্রগামীতার স্তর অনুসারে ভালোবাসা, উম্মাতের সবার উর্ধ্বে তাদের মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া। তাদের ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে দো‘আ

করা, তাদের মর্যাদা প্রচার করা ও তাদের মধ্যকার ভুল বুঝা-বুঝিকে এড়িয়ে চলা ও সমালোচনা থেকে বিরত থাকা। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, সমস্ত উত্তম আদর্শের সমন্বয়ে তারা সর্বোত্তম উম্মত, কল্যাণ ও ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে তারা অগ্রগামী, সমস্ত অকল্যাণ ও অন্যায় কাজ থেকে তারা দূরে ছিলেন, তারা সকলেই ন্যায়পরায়ণ ও ইনসাফকারী ছিলেন এবং আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট।

বিংশতম প্রশ্ন: ইমাম তথা উম্মতের ইমাম থাকার ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর: আমরা বিশ্বাস করি যে, উম্মতের ইমাম নির্ধারণ করা ফরযে কিফায়া। কেননা উম্মত ইমাম ছাড়া তাদের দীন ও দুনিয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ইমাম তাদের শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবেন এবং অপরাধীর অপরাধের হদ তথা শাস্তি কায়েম করবে। অন্যায় কাজ ব্যতীত সৎকাজে ইমামের আনুগত্য করা ছাড়া নেতার (ইমামের) নেতৃত্ব পরিপূর্ণ হয় না। ইমাম সৎ হোক বা অসৎ হোক তার সাথে জিহাদ করা, তাকে কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা করা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে তাকে সদুপদেশ দেওয়া জনগণের দায়িত্ব।

একবিংশতম প্রশ্ন: সিরাতুল মুস্তাকীম কী? এর বৈশিষ্ট্য কী কী?

উত্তর: সিরাতুল মুস্তাকীম হলো ইলমে নাফে‘ তথা উপকারী ইলম ও সৎ আমল। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন ও হাদীসে যে ইলম এসেছে তা-ই ইলমে নাফে‘ তথা উপকারী ইলম। আর সৎ আমল হলো সহীহ আক্বীদা, ফরয ও নফল আদায়, নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা, অর্থাৎ আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্ট

অর্জন করা। আর পরিপূর্ণ ইখলাস ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভবপর হয় না। এ দু'টি মূলনীতির (ইখলাস ও রাসূলের অনুসরণ) উপরই দীনের সমস্ত কাজ পরিচালিত হয়। অতএব, যার ইখলাস চলে যাবে সে শির্কে পতিত হবে আর যার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ থাকবে না সে বিদ‘আতে পতিত হবে।

দ্বাবিংশতম প্রশ্ন: কী কী গুণের কারণে মুসলিম ব্যক্তি কাফির ও নাস্তিক থেকে আলাদা হবে?

উত্তর: এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অতিদীর্ঘ একটি প্রশ্ন। মুমিন ও অমুসলিমের মধ্যকার পার্থক্যই সত্য ও মিথ্যা, সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগা নির্ধারিত হয়। জেনে রাখুন, প্রকৃত মুমিন সেই যিনি আল্লাহ প্রতি ঈমান আনে, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত তাঁর নাম ও সিফাতসমূহ জেনে বুঝে যথাযথভাবে ঈমান আনে এবং এগুলো স্বীকার করে ও যা কিছু আল্লাহর নাম ও সিফাতের বিপরীত সেগুলো থেকে তাঁকে পবিত্র রাখে। এতে তার অন্তর ঈমান, ইলম, ইয়াকীন, প্রশান্তি ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে ভরে যায়। ফলে সে একমাত্র আল্লাহর দিকে ঝুঁকে, তাঁর অনুগত হয়, তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে ইবাদত শরী‘আতসম্মত করেছেন ঠিক সেভাবেই সে একনিষ্ঠার সাথে সাওয়াবের আশায় ও আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইবাদত-বন্দেগী করে। এতে সে অন্তরে, ভাষায় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহর অশেষ নি‘আমত ও দয়ার শুকরিয়া আদায় করে, সে সার্বক্ষণিক আল্লাহর যিকিরে (স্মরণে) মশগুল থাকে। তখন সে আল্লাহর স্মরণের চেয়ে বড় কোন নি‘আমত দেখতে পায় না, এর চেয়ে বড় সম্মান সে অনুভব করে না। একমাত্র আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ও তাঁর স্মরণের তুলনায় তার কাছে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অতি

তুচ্ছ ও নগন্য ব্যাপার মনে হয়। এতদ্বসত্ত্বেও সে দুনিয়ার জীবনের যথার্থ অংশ ভোগ করে, কাফির, নাস্তিক ও অসচেতনের মতো ঢালাও ভাবে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে না। বরং এগুলোকে আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায়ের উপকরণ ও সহযোগিতা হিসাবে ব্যবহার করে। এধরণের আত্মসমালোচনা ও আকাঙ্ক্ষা তার ভোগকে পূর্ণতা দান করে, অন্তর প্রশান্ত হয় ও সুখ-বোধ হয় এবং তার পছন্দনীয় কিছু না পেলে তাতে দু:খিত ও চিন্তিত হয় না। আর এভাবে আল্লাহ তার মাঝে দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-সৌভাগ্য একত্রিত করে দেন। অন্যদিকে কাফির ও নাস্তিকরা মুমিনের সম্পূর্ণ বিপরীত। সে মহান রব আল্লাহকেই অস্বীকার করে যিনি তার অস্তিত্বের ও পরিপূর্ণতার প্রমাণে বিবেকপ্রসূত দলীল, কুরআন হাদীসের দলীল, অত্যাবশ্যকীয় বিজ্ঞান ও ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানসম্মত অসংখ্য দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন; কিন্তু এসব প্রমাণাদির প্রতি সে ভ্রুক্ষেপ করে না। ফলে সে যখন আল্লাহর বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও ইবাদাত বিমুখ হয় তখন সে প্রকৃতির পূজারীতে পরিণত হয়। তখন তার অন্তর চতুষ্পদ প্রাণীর অন্তরে পরিণত হয়। পার্থিব ভোগ-বিলাস, আমোদ-ফুর্তি ছাড়া তার আর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। তার অন্তর সর্বদা অশান্তিতে থাকে; বরং নিজের প্রিয় ও পছন্দনীয় জিনিস হারানোর ভয়ে শঙ্কিত, অন্যের ষড়যন্ত্র ও ক্ষতির আশঙ্কায় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। তার আল্লাহর প্রতি ঈমান নেই যে, তিনি কেউ তার বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত সহজকরণ ও দূরীকরণ করতে পারে। ফলে সে ঈমানের স্বাদ, আল্লাহর নৈকট্য মজা এবং ঈমানের দুনিয়া ও আখিরাতের ফলাফল থেকে বঞ্চিত থাকে। সে তার কর্মের সাওয়াব প্রত্যাশা করে না আবার অন্যায়েরও শাস্তির ভয় করে না; বরং তার ভয় ও প্রত্যাশা শুধু পার্থিব নগণ্য জিনিস অর্জন।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো সে জাতি বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে কথা-বার্তা, কাজে-কর্মে ও নিয়তে সত্যের অনুসন্ধানী, সৃষ্টিকুলের প্রতি বিনয়ী, আল্লাহর বান্দাদের প্রতি

হিতাকাঙ্ক্ষী। পক্ষান্তরে কাফির ও নাস্তিকদের বৈশিষ্ট্য হলো সত্য ও সৃষ্টিকুলের ব্যাপারে অহংকারী, আত্মকেন্দ্রিক ও কাউকে কোনো সদুপদেশ দেয় না। মুমিনের অন্তর ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত। সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যান্য মুসলিমের জন্য তা-ই পছন্দ করে এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ করে অন্য মুসলিমের জন্যও তা অপছন্দ করে। সে সাধ্যমত অন্যের কল্যাণ সাধন করে, সৃষ্টিকুলের দুঃখ-কষ্ট নিজে বহন করে, কোনো ভাবেই অন্যের ওপর যুলুম করে না। পক্ষান্তরে, কাফির ব্যক্তির অন্তর প্রতিহিংসা, শত্রুতায় ভরপুর, পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্যের জন্য কোনো উপকার ও কল্যাণ সাধন করে না, সুযোগ পেলেই সৃষ্টিকুলের ওপর যুলুম করতে দ্বিধাবোধ করে না, মানুষের বালা-মুসিবত সহ্য করার ক্ষেত্রে সে সবচেয়ে দুর্বলে পরিণত হয়। মুমিন সর্বদা সত্যবাদী ও উত্তম আচরণকারী। সহনশীলতা, শান্ত-শিষ্টতা, দয়া, ধৈর্যশীলতা, ওয়াদাপূরণ, সহজতা, নম্র স্বভাব ইত্যাদি মুমিনের গুণ। অন্যদিকে বিভ্রান্তি, অস্থিরতা, কঠোরতা, অধৈর্যতা, ভীরুতা, উদ্বিগ্নতা, মিথ্যাচারীতা, ওয়াদা খেলাফ ও দুশ্চরিত্র ইত্যাদি কাফিরের গুণ।

মুসলিম আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করে না। তার অন্তর ও মুখমণ্ডল তার রব ব্যতীত অন্যের কাছে অবনত হওয়া থেকে সর্বদা পবিত্র থাকে। তার বৈশিষ্ট্য হলো পবিত্রতা, শক্তিশালী, বীরত্ব, দানশীল ও পুরুষত্বতা। সে সবার জন্য শুধু উত্তম কিছুই পছন্দ করে। অন্যদিকে কাফির ও নাস্তিক এর বিপরীত। তার অন্তর সর্বদা সৃষ্টিকুলের ভয় ও প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল থাকে, সে নিজের স্বার্থেই তাদের জন্য ব্যয় করে, তার নেই কোনো পবিত্রতা, সচ্চরিত্রতা। শুধু গণগ্য উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তার রয়েছে শক্তি ও বীরত্ব। তার পুরুষত্ব ও মানবতা নেই। ভালো বা মন্দ যাই হোক তা অর্জনে সে পরোয়া করে না। মুসলিম ব্যক্তি কোন বস্তু অর্জনের জন্য সেটির উপকারী উপকরণ সংগ্রহ করে

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে এবং তারই উপর নির্ভর করে সকল কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে আর আল্লাহ বান্দার কাজে সাহায্য করেন। অন্যদিকে কাফিরের কোনো তাওয়াক্কুল নেই, তার নিজের দুর্বলতার দিকে দৃষ্টিপাত ছাড়া তার কোনো দূরদৃষ্টি নেই, কখনো কখনো আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন আবার কখনো তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সাহায্য না করে লাঞ্ছিত করেন। ফলে তার উদ্দেশ্য সফল করা হলে সে এটিকে তার ক্রমান্বয়ে করা কাজের সফলতা মনে করে।

মুমিন কোনো নি'আমত প্রাপ্ত হলে এর শুকরিয়া আদায় করে, সে উপকারী কাজে তা অন্যের জন্য ব্যয় করে। এতে তার কাছে আরো কল্যাণ ও বরকত ফিরে আসে। অন্যদিকে অমুসলিমরা নি'আমতদাতার থেকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট পদ্ধতিতে, দাম্ভিকভাবে নি'আমত লাভ করে, সে উপকারীর শুকরিয়া আদায় থেকে বিরত থাকে, নিজের হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তা ব্যয় করে, অথচ তার এ সম্পদ খুব দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায় এবং অচিরেই তার থেকে চলে যায়। মুমিনের বিপদাপদ ও বালা-মুসিবত আসলে ধৈর্য ও সহনশীলতা, এর বিনিময় সাওয়াবের প্রত্যাশা এবং এ বিপদ দ্রুত চলে যাওয়ার আশায় তা মোকাবিলা করে। ফলে তার পছন্দনীয় যা কিছু হারায় বা অপছন্দনীয় যা কিছু অর্জন করে এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম ও অধিক সাওয়াব লাভ করে। অপরদিকে কাফিরের কোনো প্রিয় বস্তু হারিয়ে গেলে সে এটিকে উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠার কারণ মনে করে, এতে তার মুসিবত আরও বেড়ে যায় এবং তার প্রকাশ্য কষ্টের সাথে মনের কষ্টও একত্রিত হয়। কখনও কখনও সে ধৈর্যহারা হয়ে পরে এবং তার এ বিপদের কোনো প্রতিদানের আশা নেই। ফলে তার হতাশা ও দুঃশ্চিন্তা বেড়েই চলে। মুমিন সমস্ত নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করে, সমস্ত সৃষ্টির উপরে তাদেরকে ভালোবাসে, তারা স্বীকার করে যে, কিয়ামতের দিনে তারা যেসব নি'আমত ও

প্রতিদান লাভ করবে তা তাদের অনুসরণ ও উপদেশের কারণেই এবং সেদিন সৃষ্টিকুল যে অকল্যাণ ও ক্ষতির সম্মুখীন হবে তা তাদের বিরোধিতা ও অনুসরণ না করার কারণে। নবী-রাসূলগণ সর্বোত্তম সৃষ্টি, বিশেষ করে নবীদের সর্দার ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আল্লাহ তাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ করেছেন এবং সব কল্যাণ, সংস্কার ও হিদায়াতের জন্য তাকে প্রেরণ করেছেন।

পক্ষান্তরে, কাফিররা মুমিনদের বিপরীত। তারা রাসূলদের শত্রুদেরকে সম্মান করে, তাদের মতামতকে সম্মান করে, তাদের পূর্বসূরিদের মতো তারাও নবীদের আনিত বিষয়গুলো নিয়ে উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। তাদের নির্বুদ্ধিতা ও চারিত্রিক অধঃপতনের কারণে এসব কাজ করে থাকে। মুমিনগণ সাহাবী, মুসলিমদের ইমাম ও হিদায়াতের বাণী প্রচারক ইমামদেরকে ভালোবাসে; কিন্তু কাফির এর বিপরীত। মুমিন একমাত্র আল্লাহর ইখলাসের কারণে সে সব কাজ শুধু আল্লাহর জন্যই করে এবং উত্তমরূপে আল্লাহর ইবাদত পালন করে; অন্যদিকে কাফিরের তুচ্ছ উদ্দেশ্য ব্যতীত তার কাজের কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। মুমিন ইলমে নাফে‘ তথা উপকারী ইলম ও সহীহ ঈমান, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এগিয়ে আসা, আল্লাহর স্মরণ ও সৃষ্টিকুলের উপকার সাধন ইত্যাদির ব্যাপারে প্রশস্ত হৃদয়ের, উদার মনের। সব ধরণের নিকৃষ্ট গুণাবলী ও পঙ্কিলতা থেকে তার অন্তর পবিত্র। আর গাফিল কাফিরের মধ্যে অন্তর প্রশস্ততার কারণগুলো না থাকায় তারা এসব গুণাবলীর বিপরীত।

প্রশ্ন: উপরে বর্ণিত সহীহ ঈমানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা যেহেতু বুঝা যায় যে, সহীহ ঈমানের কারণেই মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-সৌভাগ্য লাভ করে, এর দ্বারা মানুষের বাহ্যিক, অভ্যন্তরীণ, আক্বীদা, আখলাক, আদব ইত্যাদি সংশোধন হয়, সঠিক ঈমানই সমস্ত মানুষকে কল্যাণ, সংশোধন ও দৃঢ়

হিদায়েতের দিকে আহ্বান করে (উপরে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে) তাহলে অধিকাংশ মানুষ কেন দীন ও ঈমান থেকে বিমুখ? কেন তারা দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এবং কেন তাদের কেউ কেউ দীনকে উপহাস করে? আসলে ব্যাপারটি কী এর বিপরীত হওয়া উচিত নয়? কেননা মানুষের তো বিবেক বুদ্ধি আছে, সে খারাপটি থেকে ভালোটি বেছে নিতে পারে, অকল্যাণ থেকে কল্যাণটি নির্বাচন করতে পারে ও ক্ষতিকর জিনিস থেকে উপকারী জিনিসটি বের করতে পারে।

উত্তর: প্রশ্ন আল্লাহ আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি ঈমান আনার ও ঈমান না আনার কারণও উল্লেখ করেছেন। এ প্রশ্নের উত্তর উল্লেখ করলে অধিকাংশ মানুষের ঈমান না আনা ও সত্য বিমুখ হওয়াতে আশ্চর্য হবে না। আল্লাহ বহুসংখ্যক মানুষের দীন ইসলামের প্রতি ঈমান না আনার অনেক কারণ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কিছু কারণ হলো, দীন ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, ইসলামকে প্রকৃতভাবে না চেনা, এর সুউচ্চ শিক্ষা, মহান আদর্শ ও উপদেশ সম্পর্কে অজানা। এছাড়াও ইলমে নাফে‘ তথা উপকারী ইলম না জানার কারণে মানুষ প্রকৃত বাস্তবতা ও সুন্দর আখলাক পর্যন্ত পৌঁছতে বাধার সম্মুখীন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿بَلۡ كَذَّبُواْ بِمَا لَمۡ يُحِيطُواْ بِعِلۡمِهِۦ وَلَمَّا يَأۡتِهِمۡ تَأۡوِيلُهُۥۚ ٣٩﴾ [يونس: ٣٩]

“বরং তারা যে ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে নি, তা তারা অস্বীকার করেছে এবং এখনও তার পরিণতি তাদের কাছে আসে নি”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৯]

এ আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন যে, কাফিরদের মিথ্যাচার ও অস্বীকরের কারণ হলো তারা বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো, তাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান বিষয়টি পুরোপুরিভাবে ব্যপ্ত করতে পারে নি, আর তখনও তাদের কাছে

প্রতিশ্রুত আযাব আসে নি, যে আযাব আসলে বান্দা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে ও সত্যকে স্বীকার করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ يَجۡهَلُونَ ١١١﴾ [الانعام: ١١١]

“কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১১১]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٣٧﴾ [الانعام: ٣٧]

“কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৩৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ ١٨﴾ [البقرة: ١٨]

“তারা বধির-মূক-অন্ধ। তাই তারা ফিরে আসবে না।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ٢٤﴾ [الروم: ٢٤]

“নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে জাতির জন্য যারা অনুধাবন করে।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২৪]

এ ছাড়াও এ ধরণের অনেক আয়াত আছে যা তাদের অজ্ঞতা কথা বলা হয়েছে। অজ্ঞতা হয়ত সামান্য বিষয় অজানার ভান হতে পারে। যেমন, রাসূলদের প্রতি মিথ্যা প্রতিপন্ন দাওয়াত বিমুখী অধিকাংশ মিথ্যাবাদীর অবস্থা, যারা তাদের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট লোকদের অনুসরণ করে। তাদেরকে আযাব স্পর্শ করলে তারা বলবে,

﴿رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠ ٦٧﴾ [الاحزاب : ٦٧]

“হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট লোকদের আনুগত্য করেছিলাম, তখন তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬৭]

অথবা অজ্ঞতাটা যৌগিক বা জটিল অজ্ঞতা হতে পারে। এটি আবার দু’ধরণের। প্রথমত, তাদের কেউ তাদের বাপ-দাদার ধর্মে ছিলো এবং তাদের সাথে সে ধর্মের উপরই বড় হয়েছে। অতঃপর তাদের কাছে সত্য দীন এসেছে; কিন্তু সে দীনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে নি। আর যদি সে দীনের ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করেও তবে তা তার পূর্বের ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট ও তুষ্ট থেকে খুব স্বল্প পরিসরে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাবে দেখেছে এবং তার নিজের জাতির ব্যাপারে অন্ধভাবে পক্ষপাতিত্ব ও গোঁড়ামি করেছে। আর এরা হলো রাসূলদের মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী অধিকাংশ কাফির যারা রাসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলো,

﴿وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٖ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقۡتَدُونَ٢٣﴾ [الزخرف: ٢٣]

“আর এভাবেই তোমাদের পূর্বে যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার বিলাসপ্রিয়রা বলেছে, নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের ওপর পেয়েছি এবং নিশ্চয় আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৩]

আর এটিই হচ্ছে অন্ধ অনুসরণ যার অনুসারীরা মনে করে যে, সে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে, অথচ সে বাতিলের ওপর আছে। অধিকাংশ বস্তুবাদী নাস্তিকরা এ প্রকারের মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে তারা পূর্ববর্তী নেতাদের অন্ধ অনুসরণ করে। যখন তারা কোনো মতামত ব্যক্ত করে তখন তারা তা এমনভাবে অনুসরণ করে যেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অহী। আবার যখন তারা ভুল কোন কিছু আবিষ্কার করে তখন তাদের পরবর্তীরাও তাদের সাথে একমত হলেও তাদের পথে চলে আর একমত না হলেও তাদের সে ভুল পথেই চলে। এ ধরণের লোকেরা অজ্ঞ লোকদের জন্য বড় ফিতনা।

যৌগিক অজ্ঞ লোকদের দ্বিতীয় প্রকার হলো কাফিরদের নেতা ও শীর্ষস্থানীয় নাস্তিকেরা যারা নিজেদেরকে প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের সম্পর্কে খুব দক্ষ ও পাকা মনে করেন আর অন্যদেরকে অজ্ঞ মনে করেন। তারা তাদের জ্ঞানকে ক্ষুদ্র পরিধিতে আবদ্ধ করে রাখেন এবং রাসূলগণ ও তাদের অনুসারীদের উপর অহংকার করে। তারা ধারণা করে যে, মানুষের ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাই জ্ঞানের সীমা, এর বাহিরে যে সব জ্ঞান রয়েছে সেগুলো যতই বিশুদ্ধ হোক তা তারা মিথ্যারোপ ও অস্বীকার করে। ফলে তারা মহাবিশ্বের মহাপ্রতিপালক রাব্বুল আলামীনকে অস্বীকার করে, তাঁর রাসূলগণকে মিথ্যারোপ করে এবং আল্লাহর প্রেরিত ও রাসূলদের আনিত গায়েবের বিষয়াদিকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে ও অস্বীকার করে। এ শ্রেণীর লোকেরাই আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর অধিক অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

﴿فَلَمَّا جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ ٨٣﴾ [غافر: ٨٣]

“তারপর তাদের কাছে যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসল তখন তারা তাদের নিজদের কাছে যে বিদ্যা ছিল তাতেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আর যা নিয়ে তাঁরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।” [সূরা গাফির, আয়াত: ৮৩]

তাদের প্রকৃতির জ্ঞান-গরিমা ও দক্ষতাই তাদের আনন্দের অন্যতম কারণ, যা তাদেরকে সত্য বিমুখ করে বাতিলের ওপর অটুট থাকতে অত্যাবশ্যকীয় করে রাখে। যেহেতু তাদের এ আনন্দ তাদেরকে অন্যদের ওপর সম্মানিত ও প্রশংসিত করত, সেহেতু তাদের এ দুটো মিথ্যা অহংকার তাদেরকে রাসূলদের আনিত হিদায়েত ও ইলমের উপর প্রধান্য দিতো; এমনকি এ অবস্থা তাদেরকে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা রাসূলদের আনিত জ্ঞানসমূহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য

ও হেয় প্রতিপন্ন করত। ফলে তারা যেসব ব্যাপারে হেয় করত তা তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীদেরকে পূর্ববর্তী কাফিরদের ধোঁকায় পতিত করেছে, ফলে তারা সঠিক আক্বীদা ও দীনের অনুসারী হচ্ছে না। এর মূল কারণ হলো যেসব বিদ্যালয় দীনি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না সেসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া শেষে দীনি ইলম সম্পর্কে মোটেও পারদর্শী হয় না, ইসলামী শরী'আতের সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান হয় না, সে নিজেকে এমন মহাপণ্ডিত ভাবে যে, অন্যরা কিছুই জানে না। ফলে সে দীন ও দীনদারদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে শুরু করে। আর এ ধৃষ্ট কাজগুলো তাকে বস্তুবাদী নাস্তিকদের নেতার আসনে বসতে সহজ করে। এ ক্ষতিকর মুসিবতটি ইসলামী বিশ্বে সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব, সবকিছুর আগে মুসলিমদের কর্তব্য হলো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে দীনি শিক্ষার গুরুত্বারোপ করা, কেননা পরবর্তী সফলতা ও ব্যর্থতা এ শিক্ষার উপরই নির্ভরশীল; বরং অন্য সবকিছু এ শিক্ষারই অনুসারী হবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, দায়িত্বশীল ও শিক্ষকদের জন্য এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয কাজ। জাতির ভবিষ্যৎ এ কাজের ওপরই নির্ভরশীল। তাই যারা এ কাজের প্রতিনিধি বা যাদের কথায় এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় তাদের আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত, এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির নিয়ত করা উচিৎ এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দীন শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। কেননা এ শিক্ষাকে অবহেলা করলে জাতি ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হবে। জাতির সংশোধন ও কল্যাণ দীনি শিক্ষার গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যেই রয়েছে। অন্যান্য লোকদের দীন গ্রহণ ও ঈমান আনয়ন করতে অন্যতম বাধা হচ্ছে প্রতিহিংসা, সীমালঙ্ঘন যেমন ইয়াহূদীদের অবস্থা, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, তাঁর সত্যতা ও বাস্তবতা এমনভাবে জানে ও চেনে যেভাবে তারা তাদের সন্তানদেরকে চেনে; কিন্তু তারা

পার্থিব নগণ্য স্বার্থ হাসিলের লোভে জেনে শুনেও তা গোপন করছে। মক্কার কুরাইশ নেতাদেরকেও এ রোগে আক্রান্ত করেছিল, যা ইতিহাস ও সীরাতের কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে। তাদের অহমিকা ও গর্ববোধের কারণে এ ব্যাধি তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, আর এ অহমিকাই সত্য অনুসরণ ও ঈমান গ্রহণে সবচেয়ে বড় বাধা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿سَأَصۡرِفُ عَنۡ ءَايَٰتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ﴾ [الاعراف: ١٤٥]

"যারা অন্যায়ভাবে জমিনে অহঙ্কার করে আমার আয়াতসমূহ থেকে তাদেরকে আমি অবশ্যই ফিরিয়ে রাখব।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৪৫]

সত্য প্রত্যাখ্যান করা ও সৃষ্টিকুলকে হেয় প্রতিপন্ন করার অহংকার অনেককেই দলীল-প্রমাণ প্রকাশিত হওয়ার পরেও সত্যের অনুসরণ ও গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُوّٗاۚ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ١٤﴾ [النمل : ١٤]

"আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল; অথচ তাদের অন্তর তা নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল। অতএব, দেখ, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ১৪]

ঈমান না আনার আরেকটি কারণ হলো আসমানী দলীল-প্রমাণ ও সঠিক বিবেকসম্পন্ন দলীল থেকে বিমুখ থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَمَن يَعۡشُ عَن ذِكۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَيِّضۡ لَهُۥ شَيۡطَٰنٗا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٞ ٣٦ وَإِنَّهُمۡ لَيَصُدُّونَهُمۡ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحۡسَبُونَ أَنَّهُم مُّهۡتَدُونَ ٣٧﴾ [الزخرف: ٣٦، ٣٧]

"আর যে পরম করুণাময়ের যিকির থেকে বিমুখ থাকে আমরা তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী। আর নিশ্চয় তারাই (শয়তান) মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়। অথচ মানুষ মনে করে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৩৬-৩৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿وَقَالُواْ لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ١٠﴾ [الملك: ١٠]

“আর তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ১০]

যারা নিজেদের আকল ও উপকারী শ্রবণ না থাকার স্বীকৃতি নিজেরাই দিয়েছে তারা রাসূলদের আনিত জ্ঞান ও আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবে ঈমান আনতে আগ্রহী ছিলো না। তাদের কোন সুস্থ বিবেক ছিলো না যা তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে; বরং তাদের ছিল কিছু ভুল ধারণা ও ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা যা তারা তাদের মূর্খ বিবেক দ্বারা চিন্তা-ভাবনা করত। তারা ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট নেতাদের অনুসরণ করত, তারা তাদেরকে সত্য গ্রহণ করতে নিষেধ করত, এভাবেই তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর অহংকারীদের জন্য জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট জায়গা!

সত্য অনুসরণ থেকে বিরত থাকার আরেকটি বাধা হচ্ছে সত্য তার কাছে স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তা প্রত্যাখ্যান করা। এ কারণে তার অন্তরকে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। তখন তার কাছে ভালোকে খারাপ আর খারাপকে ভালো সাজিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ ٥﴾ [الصف: ٥]

“অতঃপর তারা যখন বাঁকাপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়গুলোকে বাঁকা করে দিলেন।” [সূরা আস-সাফ, আয়াত: ৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿وَنُقَلِّبُ أَفۡـِٔدَتَهُمۡ وَأَبۡصَٰرَهُمۡ كَمَا لَمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٖ وَنَذَرُهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ ١١٠﴾

[الانعام: ١١٠]

“আর আমরা তাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ পালটে দেব, যেমন তারা কুরআনের প্রতি প্রথমবার ঈমান আনে নি এবং আমরা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় ঘুরপাক খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেব।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১১০]

এটা মূলত তাদের কর্মের অনুরূপ শাস্তি। তাদের কথা অনুযায়ী আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য তাদের মধ্য থেকে অভিভাবক নির্ধারণ করে দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَٰطِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ٣٠﴾ [الاعراف: ٣٠]

“নিশ্চয় তারা শয়তানদেরকে আল্লাহ ছাড়া অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে।” [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৩০]

কাফির ও নাস্তিকদের ঈমান না আনার আরেকটি কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত বিলাসিতা ও নি‘আমতের অপব্যয়ে নিমজ্জিত থাকা। কেননা এ কাজ মানুষকে তার খাম-খেয়ালী ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অনুসারী করে তোলে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা এ বাধার কথা অনেক আয়াতে বলেছেন,

﴿بَلۡ مَتَّعۡنَا هَٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمۡ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡعُمُرُ﴾ [الانبياء: ٤٤]

“বরং আমরাই তাদেরকে ও তাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপভোগ করতে দিয়েছিলাম; উপরন্তু তাদের হায়াতও দীর্ঘ হয়েছিল।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৪৪]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেছেন,

﴿إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَبۡلَ ذَٰلِكَ مُتۡرَفِينَ٤٥﴾ [الواقعة: ٤٥]

“নিশ্চয় তারা ইতোপূর্বে বিলাসিতায় মগ্ন ছিল।” [সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ৪৫]

অতএব, যখন তাদের কাছে সঠিক দীন এসে তাদের বিলাসিতাকে সমতা করতে, তাদেরকে ন্যায্য উপকারী একটি সীমানায় থাকতে, ক্ষতিকর লোভ-লালসা ও প্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকতে বলেছে তখন তারা উক্ত দীনকে তাদের

স্বার্থের বিপরীত ও তাদের ভ্রান্ত বাতিল প্রবৃত্তির বাধাস্বরূপ দেখল। কিন্তু যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে দীন আসল যা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করতে ফরয করে এবং প্রবৃত্তির লালসায় নিমজ্জিত থাকতে নিষেধ করে তখন প্রবৃত্তির অনুসারীরা সর্বাত্মকভাবে বাতিলকেই সাহায্য করল। ফলে তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে পশ্চাদপসরণ করল।

অবিশ্বাসীদের দীন গ্রহণ না করার আরেকটি বাধা হলো মিথ্যাবাদীরা রাসূল ও তাদের অনুসারীদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এবং রাসূলদের অনুসারীদেরকে দুর্বল ও নিম্নমানের ধারণা করা। যেমন, আল্লাহ তা'আলা নূহ আলাইহিস সালামের জাতি সম্পর্কে বলেছেন,

﴿قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلۡأَرۡذَلُونَ ١١١﴾ [الشعراء : ١١١]

“তারা বলল, আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তোমাকে অনুসরণ করছে।” [সূরা আশ-শুআ'রা, আয়াত: ১১১]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

﴿وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمۡ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأۡيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمۡ عَلَيۡنَا مِن فَضۡلِۭ﴾ [هود: ٢٧]

“এবং আমরা দেখছি যে, কেবল আমাদের নীচু শ্রেণীর লোকেরাই বিবেচনাহীনভাবে তোমার অনুসরণ করেছে। আর আমাদের ওপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব আমরা দেখছি না।” [সূরা হূদ, আয়াত: ২৭]

আসলে তাদের আত্ম অহংকারের কারণেই এ ধরণের ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ যখন অহংকার করে, নিজেকে অনেক বড় মনে করে ও অন্যকে তুচ্ছ মনে করে তখন সত্য গ্রহণে সে সঙ্কুচিত হয়ে যায়, এমনকি যদিও ধরে নেওয়া হয় যে, তার এ ধারণাকে প্রতিহত করা হবে তথাপি সে অন্যভাবে নিজেকে বড় মনে করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿كَذَٰلِكَ حَقَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓاْ أَنَّهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ٣٣﴾ [يونس : ٣٣]

“এমনিভাবে তোমার রবের বাণী সত্য বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাদের ওপর, যারা অবাধ্য হয়েছে, যে তারা ঈমান আনবে না।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩৩]

অতএব, ফিসক তথা অবাধ্যতা হলো বান্দা আল্লাহর অনুগত্য থেকে বের হয়ে শয়তানের অনুগত্য করা। কারো অন্তর এ ধরণের ঘৃণ্য দোষে দুষিত হলে সেটি তার কথায় ও কাজে সত্য গ্রহণে সবচেয়ে বড় বাধা। আল্লাহ তা‘আলা এ ধরণের লোকদের কখনও প্রশংসা করেন নি; বরং তাকে যালিম বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফলে সে অহংকার ও পথভ্রষ্টতায় বাতিলের মধ্যে ঘুরপাক করে। তার সমস্ত কাজ-কর্ম ও চলাফেরা অন্যায় ও বিশৃঙ্খলাময় হয়ে থাকে। অতএব, ফাসেকী সর্বদা বাতিলের সাথে মিলিত হয় এবং সত্য থেকে বাধা দেয়, কেননা মানুষের অন্তর যখন আল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতা থেকে বেরিয়ে যায় তখন সে বিতাড়িত বিদ্রোহী শয়তানের বশ্যতা স্বীকর করে।

﴿وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيۡطَٰنٖ مَّرِيدٖ٣ كُتِبَ عَلَيۡهِ أَنَّهُۥ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُۥ يُضِلُّهُۥ وَيَهۡدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ٤﴾ [الحج : ٣، ٤]

“এবং সে অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের। তার সম্পর্কে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, যে তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে অবশ্যই তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে প্রজ্বলিত আগুনের শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে। [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াত: ৩-৪]

সত্য অনুসরণ ও ঈমান আনায়নের আরেকটি বড় বাধা হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ করে রাখা যেমনটি করে বস্তুবাদীরা ইন্দ্রিয় অনুভবের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে থাকেন। তাই যেগুলোকে তাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধগম্য হয় সেগুলোকেই তারা বিশ্বাস করে আর যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় সেগুলোকে তারা অবিশ্বাস করে; যদিও তা অন্য পদ্ধতিতে এবং ইন্দ্রিয় অনুভবের চেয়ে আরও শক্ত ও স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দ্বারা

প্রমাণিত তবুও তারা তা স্বীকার করে না। এ ফিতনা ও সংশয়ের কারণে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ খবিশ পদ্ধতি মহাবিশ্বের রবের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, রাসূলদের সাথে কুফুরী করে এবং তাদের আনিত সে সব গায়েবের সংবাদসমূহকে অস্বীকার করে যা বিশ্বাস করতে অনের যুক্তি প্রমাণ দ্বারা দলীল পেশ করা হয়; বরং প্রকৃতপক্ষে এগুলো চাক্ষুষ দলীল- প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। এ কথা অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য জ্ঞান ও ইয়াকীনী ইলম যে, আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ববাদ, একচ্ছত্র সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালনার প্রমাণাদি অন্যান্য পদ্ধতির দলীলের সমান নয় বা অন্য দলীলের সাথে তুলনা করা যাবে না। কেননা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ আসমানী নাযিলকৃত দলীল, বিবেক প্রসূত দলীল, চাক্ষুষ দলীল ও স্বভাবজাত প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত। বিশ্বজগতে ও মানুষের মধ্যে তিনি তাঁর নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, তিনি সত্য, তাঁর রাসূলগণ সত্য, তাঁর প্রতিদান সত্য, তাঁর প্রদেয় সমস্ত সংবাদ (অহী) সত্য ও তাঁর দীন সত্য। অতএব, সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরে না অনুসরণ না করলে বাতিল ছাড়া আর কী থাকতে পারে। কিন্তু বস্তুবাদীদের ঔদ্ধত্যতা ও তাদের অহংকার তাদের ও সে উপকারী সত্যের মাঝে প্রতিবন্ধক যে সত্য ছাড়া কেউ কোনভাবেই উপকৃত হতে পারবে না। দৃষ্টিসম্পন্ন মুমিন তার দূরদর্শিতার আলোকে সে সত্য জানেত পারে এবং বুঝতে পারে যে, কাফিররা স্পষ্ট গোমরাহী ও অন্ধত্বের স্তুপে নিমজ্জিত। আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়েতের নি‘আমত দান করায় আমরা তাঁর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করছি।

কাফির ও নাস্তিকদের ঈমান আনায়নে আরেকটি বাধা হলো বস্তুবাদীরা ও তাদের ধোঁকায় নিমজ্জিত তাদের অনুসারীরা মনে করেন যে, বস্তু উত্তেলিত হওয়া এবং প্রাকৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষের জানার আগে মানুষের জ্ঞান পরিপক্ক ছিলো না। এর আগে মানুষের জ্ঞান পূর্ণতায় পৌঁছে নি। আসলে এটি

হলো তাদের দুঃসাহস দেখানো, কূটতর্কের এগিয়ে আসা, সত্য ও বাস্তবতার ব্যাপারে অহমিকা এবং অহংকার প্রদর্শন। এ কথা সামান্য জ্ঞানের অধিকারী সকলেরই জানা যে, তারা তাদের খবিশ মতাদর্শ থেকে কখনও ফিরে আসে নি। সুতরাং তারা যদি বলত যে, বস্তু, শিল্প-কারখানা, আবিষ্কার, প্রকৃতিক বিষয়ের উন্নতি ইত্যাদি শেষের দিকে অর্থাৎ বর্তমান সময় ছাড়া পূর্ণতা ও পক্কতা লাভ করে নি তাহলে তাদের কথা ঠিক ছিলো। কিন্তু সঠিক জ্ঞান, স্থির বাস্তবতা ও সুন্দর চরিত্র ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তাদের সংজ্ঞা, দু:সাহস প্রদর্শন ও অন্যায়মূলক কথা হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার। কেননা বিবেক, সঠিক জ্ঞান তখনও চেনা যেতো, এর পূর্ণতা বা অপূর্ণতা এর প্রভাব, দলীল ও লক্ষ-উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রমাণিত ছিলো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত সে সব মহৎ আচার আচারণ, আক্বীদা, আখলাক, দীন, দুনিয়া, রহমত, হিকমত ইত্যাদি সম্পর্কে সুউচ্চ চিন্তা চেতনা সম্পর্কে লক্ষ করুন। এসব গুণাবলী মুসলিমগণ তাদের নবীর থেকে গ্রহণ করেছেন এবং এগুলো আমলের সাথে সাথে দীন ও দুনিয়ার সমস্ত কল্যাণকর ও ভালো কাজগুলো অন্যের কাছেও পৌঁছে দিয়েছেন। পরবর্তীতে বিশ্বের সব জাতি তাদের এসব গুণাবলীর কাছে নতস্বীকার করেছেন এবং তারা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, মুসলিমরা পূর্ণতার এমন এক চরম শিখরে পৌঁছেছেন যে অন্যরা সেখানে পৌঁছতে পারে নি; এমনকি অন্যরা তাদের দেখানো জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথেই চলতে লাগল। এবার বস্তুবাদীদের চরিত্র দেখুন, তারা তাদের খাম-খেয়ালী ও মনোবাসনা চরিতার্থ করতে বস্তুকে ব্যবহার করেছে, তারা এখানেই থেমে থাকে নি; বরং তারা তাদের হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিম্ন থেকে নিম্নতর স্তরে নেমে গিয়ে বলেছে, বস্তু একটির সাথে আরেকটি লেগে থাকার শক্তি না থাকলে মহাবিশ্বের সব কিছু তাৎক্ষণিক ধ্বংস হয়ে যেতো। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعۡمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَۚ﴾ [ابراهيم: ٤٢]

"আর যালিমরা যা করছে, আল্লাহকে তুমি সে বিষয়ে মোটেই গাফেল মনে করো না।" [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪২]

অতএব, যদি পূর্ববর্তী উন্নত জাতিসমূহের মধ্যে আল্লাহর দীনের দুনিয়া সংক্রান্ত আদবসমূহ অবশিষ্ট না থাকত তাহলে বর্তমান বস্তুবাদীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির কোনই মূল্য থাকত না। কেননা যারা দীনহারা তারা দুনিয়ায় পুত:পবিত্র, আনন্দময় ও সুখী জীবন যাপনে ব্যর্থ। বাস্তব দর্শন ও অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় সাক্ষী। আরবের মুশরিক ও তাদের মতাদর্শীরা যাদের কিছুটা ঈমান ও ঈমানের কতিপয় উসূলের যেমন, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত (আল্লাহকে রব হিসেবে মানা) ও প্রতিদান দিবসের স্বীকৃতি সম্পর্কে সামান্য স্বীকৃতি ছিলো তারা নিঃসন্দেহে বর্তমানের বস্তুবাদীদের চেয়ে ভালো ছিলো। তাছাড়া এ কথা সকলেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় যে, আল্লাহর রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত অহী, হিদায়াত, নূর, সঠিক ইলম ও সর্বময় কল্যাণ নিয়ে এসেছেন তা সুস্থ জ্ঞান ও বিবেক স্বীকৃতি দেয়, সে বিবেক অবশ্যই জানে যে, সবাই এ জ্ঞানের অত্যন্ত মুখাপেক্ষী এবং রাসূলদের আনিত সব কিছু মানতে প্রস্তুত থাকে। সঠিক বিবেক বুঝে যে, রাসূলগণ যে উপকারী ইলম ও কিতাব নিয়ে এসেছেন পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই একত্রিত হয়েও সে ধরণের কিতাব তারা রচনা করতে সক্ষম হবে না। এছাড়াও সুস্থ বিবেক জানে যে, নবীদের উক্ত অহী না থাকলে মানব জাতি অবশ্যই স্পষ্ট গোমরাহী, মহা অন্ধকার, দুর্ভাগ্য ও সর্বদা ধ্বংসে পতিত হতো। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ﴾ [ال عمران: ١٦٤]

“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৬৪]

অতএব, রাসূলদের আনিত জ্ঞান ব্যতীত মানুষের বিবেক সঠিক পূর্ণতায় ও পরিপক্কতায় পৌঁছতে পারে না। এ কারণেই সঠিক জ্ঞান ও দূরদর্শিতার অভাবে কতিপয় শব্দ দ্বারা বাতিলকে সুসজ্জিত করে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তারা (বস্তুবাদীরা) অনেক মানুষকে ধোঁকায় ফেলেছে। যেমন, তারা দীনের জ্ঞান ও সুউচ্চ আখলাকসমূহকে পশ্চাদগামিতা এবং তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দীনের বিপরীত আখলাককে সংস্কৃতি ও প্রগতি বলে নামকরণ করে থাকেন। সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী সকলের কাছেই এটি স্পষ্ট যে, যেসব সংস্কৃতি ও সংস্কারের মূলনীতিসমূহ দীনের হিদায়েতে ও দিক নির্দেশনার সাথে সম্পৃক্ত নয় তা অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য অকল্যাণকর ও পথভ্রষ্টতা। কেউ সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলেই দেখতে পাবে যে, যাদেরকে বস্তুবাদী সভ্য বলা হয় তারা চারিত্রিক অধঃপতনে ও সমস্ত ক্ষতিকর কাজে অগ্রগামী ও উপকারী কাজে নিম্নগামী। পক্ষান্তরে সুস্থ সভ্যতা ও সংস্কৃতি হলো বিবেকের সভ্যতা যা রাসূলদের হিদায়েত ও তাদের আনিত সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন বিবেক। আর চারিত্রিক সভ্যতা হলো প্রশংসিত সুন্দর সচ্চরিত্র ও উপকারী দিক নির্দেশনায় সভ্য হওয়া যা সকলের জন্য কল্যাণকর ও সঠিকতা, ভালো ও সফলতার কাজে সঠিক জ্ঞানের দ্বারা সহযোগিতা করা। ইসলাম সর্বদা দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য অর্জন ও উভয় জগতে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে আদেশ ও উৎসাহিত করে। দীন ইসলাম কুরআন ও হাদীসে সংক্ষিপ্তাকারে ও সবিস্তারে যা কিছু নিয়ে এসেছে সেগুলো নিয়ে কেউ গবেষণা করলে জানতে

পারবে যে, ইসলামের হিদায়েত ও দিক নির্দেশনার দিকে ফিরে না গেলে এবং সে অনুযায়ী না চললে মানব জাতির কল্যাণ সাধিত হবে না। ইসলাম যেমনিভাবে আক্বীদা, আখলাক ও ভালো কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনিভাবে এটি দুনিয়াবী কাজের জন্যও প্রযোজ্য। ইসলাম সর্বদা সকলের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিক কল্যাণ ও উপকারের পথ নির্দেশ করে। আল্লাহ হলেন তাওফীকদাতা ও হিদায়াতকারী। আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

বৃহৎ দীনের (ইসলামের) মূলনীতি (উসূল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা।

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি বৃহৎ দীনের (ইসলামের) মূলনীতি সংক্ষেপে জানতে প্রশ্ন করেছেন।

উত্তর: এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অনেক বড় প্রশ্ন। এর উত্তরও অনেক বড়। কেননা এ প্রশ্নের উত্তরে ইসলামী শরী'আত ও ঈমানের হাকীকত যেসব মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে গঠিত সেসব মূলনীতির সবগুলো আলোচনা করা প্রয়োজন। উত্তর প্রদানের আগে আমি একটি বিষয় পাঠককে বলতে চাই যে, এ প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত ও দলীল উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা থাকায় এর উত্তর সংক্ষেপে আমি যথাযথভাবে দিতে পারব না। তবে কায়েদায় আছে, কোনো জিনিসের পুরোটা অনুধাবন করা না গেলেও তার পুরোটা চলে যায় না (অর্থাৎ কিছুটা হলেও বুঝা যায়)। তাই এখানে আমি ইশারায় ও সংক্ষেপে মহান দীন ইসলামের উসূল আলোচনা করব। এ দীনের অনেক উসূল রয়েছে; তবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উসূলগুলো আমি নিম্নে বর্ণনা করব।

প্রথম উসূল: তাওহীদ

তাওহীদের সব প্রকার সন্নিবেশিত পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা হলো, পরিপূর্ণ গুণের সমন্বয়ে রবের একত্বতা সম্পর্কে বান্দার বিশ্বাস ও ঈমান এবং সব ধরণের ইবাদত একমাত্র তাঁর জন্যই করা। তাহলে এ সংজ্ঞায় তাওহীদের সব প্রকারই শামিল করেছে। তা হলো, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত তথা রবকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, পরিচালনাকারী ও লালন পালনকারী হিসেবে স্বীকার করা। তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত তথা আল্লাহ নিজের জন্য যেসব নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন বা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য যেসব নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন এবং তা কোনো সাদৃশ্য ও উপমা ব্যতীত, বিকৃতি ও পবিরর্তন ব্যতিরেকে যেসব গুণাবলী এগুলোর ওপর প্রমাণ করে সেগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। তাওহীদুল

ইলাহিয়্যাত ওয়াল ইবাদাত তথা সব ধরণের ইবাদাতের জন্য আল্লাহকে এক ও একক করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে তাঁকে একক করা এবং তাঁর পরিপূর্ণ ইলাহিয়্যাতের স্বীকৃতি দেওয়া।

অতএব, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়। যথা: আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের ওপর বিশ্বাস সাব্যস্ত হওয়া, তিনি যা চান তাই হয়, আর তিনি যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না, তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান, তিনি মুখাপেক্ষীহীন, প্রশংসিত আর তিনি ছাড়া সবাই সব দিক থেকে তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়: কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সব আসমাউল হুসনা তথা আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ, এসব নামসমূহের তিনটি স্তরের প্রতি ঈমান আনা, নামসমূহের প্রতি ঈমান, সিফাত তথা নামের গুণের প্রতি ঈমান ও এসব সিফাতের আহকামের প্রতি ঈমান আনা। যেমন, আল্লাহ আলীম তথা মহাজ্ঞানী, মহাজ্ঞানের অধিকারী। তিনি সব কিছু পূর্ণাঙ্গরূপে জানেন। তিনি কাদীর তথা সর্বশক্তিমান, মহাশক্তির অধিকারী, সব কিছুর ওপর তাঁর শক্তি রয়েছে। এভাবে বাকী আসমাউল হুসনা তথা আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ, সিফাতসমূহ ও এর থেকে নির্গত গুণসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাতের মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্তি করে, সমস্ত সৃষ্টির ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব, তাঁর আরশের উপর আসন গ্রহণ, তাঁর সম্মান ও বড়ত্ব তাঁর শান অনুযায়ী যেভাবে হওয়া দরকার সেভাবে থেকেই তিনি প্রতি রাতে প্রথম আসমানে অবতরণ করেন।

এছাড়াও তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাতের মধ্যে শামিল হয়, যেসব যাতী সিফাত যা তাঁর থেকে কখনই আলাদা হয় না সেগুলো সাব্যস্ত করে। যেমন, শ্রবণ, দেখা, ঊর্ধ্বে থাকা ইত্যাদি। এছাড়াও আছে অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর ফে‘লী

সিফাত, তা হচ্ছে, তাঁর ইচ্ছা ও কুদরতের সাথে সম্পৃক্ত সিফাতসমূহ। যেমন, কালাম তথা কথা বলা, সৃষ্টি করা, রিযিক দেওয়া, রহমত করা, আরশে আসন গ্রহণ করা, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করা। তবে এসব গুণাবলী তাঁর সাথে কারো সাদৃশ্য না করে বা কোন রকম বিকৃতি ও পরিবর্তন ছাড়াই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। এসব গুণাবলী তাঁর জন্য নির্ধারিত এবং তিনি এসব গুণে গুণান্বিত। আল্লাহ্ সর্বদা কাজ ও কথা বলেছেন এবং তিনি সর্বদাই কাজ করবেন ও কথা বলবেন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। যখন ও যেভাবে ইচ্ছা কথা বলেন। তিনি সর্বদা কথা বলার গুণে গুণান্বিত এবং রহমাতের গুণে প্রসিদ্ধ।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাতের মধ্যে আরো অন্তর্ভুক্ত হয়, আল-কুরআন আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী, এটি তাঁর সৃষ্টি নয়, এটি তাঁর থেকেই এসেছে এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবে, তিনি এর শব্দ ও অর্থ উভয়ের কথক, তাঁর বাণী শেষ হবে না এবং পরিবর্তনও হবে না, এসবের ওপর ঈমান আনয়ন করা।

এতে আরও শামিল হয়, তিনি সর্বাধিক নিকটে ও সাড়াদানকারী, এতদসত্ত্বেও তিনি সুউচ্চ ও সবার ঊর্ধ্বে। তাঁর সর্বাধিক নিকটবর্তী হওয়া ও সর্বাধিক উপরে হওয়ার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নেই। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর নামসমূহ, সিফাতসমূহ, কর্মসমূহ ও এর আহকামসমূহ যেভাবে তাঁর মহান শানে যোগ্য সেভাবেই সেগুলো ওপর পরিপূর্ণ ঈমান না আনলে তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাতের ওপর পূর্ণাঙ্গ ঈমান আনা হবে না। এভাবে আরও দৃঢ়ভাবে জানা যে, তাঁর যাতের অনুরূপ যেমন কেউ নেই তেমনি তাঁর সিফাতের অনুরূপও কেউ নেই। কেউ তাঁর কোনো সিফাতকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যাখ্যা করে অন্যের জন্য সাব্যস্ত করলে সে স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত।

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত ততক্ষণ পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ বান্দা বিশ্বাস করবে যে, বান্দার সমস্ত কাজ আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাদের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী হয়, তবে কাজটি সংঘটিত হতে তাদের পূর্ণ সক্ষমতা ও ইচ্ছা থাকে। কাজের জন্য প্রশংসা, নিন্দা, আদেশ, নিষেধ, সাওয়াব ও শাস্তি বান্দার সাথেই সম্পৃক্ত। এখানে দু'টি বিষয় পরস্পর বিপরীতমুখী নয়, কেননা আল্লাহর যাত, কর্মসমূহ ও সিফাতের জন্য সর্বব্যপ্তি সাধারণ ইচ্ছা সাব্যস্ত করা আর কাজ ও কথা বাস্তবায়নে বান্দার সক্ষমতা ও শক্তি সাব্যস্ত করা।

এছাড়াও তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত ততক্ষণ পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ বান্দা তার সমস্ত কথা ও কাজে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও একনিষ্ঠতা না করবে; এমনকি তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত শির্কে আকবর তথা বড় শির্ক ছেড়ে দিলেও সে যদি কোনো ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করে তাহলেও তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত পূর্ণ হবে না। এ তাওহীদের বাস্তবায়ন করতে হলে সব ধরণের ছোট শির্ক ছেড়ে দিতে হবে। আর ছোট শির্ক হলো যেসব শির্ক বড় শির্কের দিকে ধাবিত করে। যেমন, আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে শপথ করা, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদাত করা ইত্যাদি।

তাওহীদের ক্ষেত্রে আল্লাহকে জানা, তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইবাদত-বন্দেগী করার ভিত্তিকে মানুষ কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন তারা যারা আল্লাহর নামসমূহ, তাঁর সিফাতসমূহ, কাজসমূহ ও তাঁর নি'আমতসমূহ, তিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে যা বলেছেন, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত কিয়ামত দিবস ও প্রতিদান ইত্যাদি বিস্তারিত জানে, এর সঠিক অর্থ জানে ও বুঝে, অতঃপর আল্লাহকে ও তাঁর মহাত্ব, বড়ত্ব, ভালোবাসা, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা ইত্যাদি জেনে তার অন্তর ঈমানে ভরে যায় এবং তার অন্তর আল্লাহর প্রতি আকর্ষিত ও বিমুগ্ধ হয়। এছাড়াও সে একমাত্র আল্লাহর দিকে ফিরে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে না, তার সমস্ত কাজ-কর্ম, চলাফেরা

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হয়ে থাকে, এর দ্বারা পার্থিব কোন কিছু প্রত্যাশা করে না। ফলে আল্লাহকে জানা, তাঁর সমীপে বিনয়ী হওয়া, কোনো কাজ করা বা ছেড়ে দেওয়া সব ক্ষেত্রেই তার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। এতে তার অন্তরে ইখলাস পরিপূর্ণ হয়, সে অনুযায়ী সে চলতে থাকে এবং অন্যকেও এ মূলনীতির দিকে দাওয়াত দিয়ে তাকেও পরিপূর্ণ করে।

ঈমানদার ও তাওহীদে বিশ্বাসীদেরকে ভালোবাসা, তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা, শির্ক ও মুশরিকদদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, আল্লাহর জন্যই কাউকে বন্ধু করা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কারো সাথে শত্রুতা করা, তার ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার অনুগামী হওয়া ব্যতীত কারো তাওহীদ পরিপূর্ণ হবে না। আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছি তিনি যেন তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাদেরকে তাওহীদের নি‘আমত দান করেন।

দ্বিতীয় উসূল: সমস্ত নবীদের প্রতি সাধারণভাবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশেষভাবে ঈমান আনয়ন করা

এ উসূলের মূল হলো, বান্দা স্বীকার করবে ও বিশ্বাস করবে যে, সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ অহী ও রিসালাত দিয়ে নির্বাচিত করেছেন, তাদেরকে তিনি তাঁর শরী‘আত ও দীন পৌঁছানোর জন্য তাঁর ও সৃষ্টিকুলের মধ্যে মধ্যস্থ বানিয়েছেন এবং তাদের সত্যায়ন ও তাদের আনিত বিষয়গুলোর সঠিকতা প্রমাণের জন্য তিনি তাদেরকে মু‘জিযা দিয়ে সাহায্য করেছেন। তারা সৃষ্টিগত, বিদ্যা-বুদ্ধি ও আমলের দিক থেকে সবচেয়ে পরিপূর্ণ মানব। তারা সর্বাধিক সৎ ও নেককার, চরিত্র ও কর্মের দিক থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তি। আল্লাহ তাদেরকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিশিষ্ট করেছেন, তাদেরকে এমন সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন যা তিনি অন্যদেরকে দেন নি, সমস্ত অসচ্চরিত্র ও নোংরামী থেকে আল্লাহ তাদেরকে পবিত্র রেখেছেন, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যা পৌঁছে দিয়েছেন সে ব্যাপারে নিষ্পাপ, আল্লাহ তাদের দেওয়া সংবাদ ও দাওয়াত শুধু

হক ও সঠিক হওয়ার উপর স্থির থাকেন, আল্লাহ তাদেরকে ভুলের ওপর স্থায়ী রাখেন না। তাদের সকলের ওপর ও তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলোর উপর ঈমান আনা, তাদেরকে ভালোবাসা ও সম্মান করা ফরয। এসব কিছু আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আরও অধিক পূর্ণরূপে সাব্যস্ত ও প্রমাণিত। তিনি শরী'আতের যা কিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলো সাধ্যানুযায়ী সংক্ষিপ্তাকারে ও বিস্তারিত জানা, এসবের উপর ঈমান আনা, এগুলোকে আঁকড়িয়ে ধরা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত সংবাদের ওপর সর্বদা ঈমান রাখা, তার আদেশ মান্য করা ও তার নিষেধ থেকে বিরত থাকার ওপর সুদৃঢ় থাকা।

আরও ঈমান রাখা যে, তিনি খাতামুন নাবীয়্যীন তথা সর্বশেষ নবী, তার শরী'আত পূর্ববর্তী সব শরী'আতকে রহিত করেছে, তার নবুওয়াত ও শরী'আত কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে, তার পরে আর কোন নবী আসবেন না, দীনের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখার ব্যাপারে তার শরী'আত ছাড়া আর কোনো শরী'আত থাকবে না।

রাসূলগণের প্রতি ঈমানের মধ্যে তাদের আনিত কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করাও অন্তর্ভুক্ত। অতএব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেস উপর ঈমান আনয়ন করলে তার আনিত কিতাব আল-কুরআন ও সমস্ত সুন্নাহের প্রতি শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকে ঈমান আনা অত্যাবশ্যকীয়। তাই এ দুয়ের প্রতি ঈমান না আনলে তার ঈমান পূর্ণ হবে না। যে ব্যক্তি এসবের প্রতি সর্বোচ্চ পরিমাণে ইলম লাভ, বিশ্বাস, স্বীকৃতি অর্জন ও আমল করতে পরবে সে ব্যক্তি ততবেশি পরিপূর্ণ ঈমানদার।

এ মহা মূলনীতির মধ্যে ফিরিশতাদের প্রতি সাধ্যানুযায়ী ঈমান আনাও শামিল। ঈমানের পূর্ণতার মধ্যে হলো, এ কথা জানা যে, তারা নবীদের কাছে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলো সত্য, আক্কলী বা ইন্দ্রিয় কোনো প্রমাণ এর বিপরীত

হতে পারে না, এমনিভাবে নকলী তথা বর্ণনাভিত্তিক দলীলও এর বিপরীত হতে পারে না। অতএব, সুস্থ বিবেক ও ইন্দ্রিয় কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসার প্রমাণ বহন করে, এগুলোর উপর আমল করতে উৎসাহিত করে, তাছাড়া কুরআন ও সুন্নাহে ক্ষতিকর কোনো বিষয় উল্লেখ নেই তাও সুস্থ বিবেক ও ইন্দ্রিয় প্রমাণ করে; যদিও শর'ঈ দলীল কুরআন ও সুন্নাহ- এ ক্ষতিকর কিছু থাকা নিষেধ করেছে ও এ ব্যাপারে নিন্দা করেছে।

তৃতীয় উসূল: কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান

কুরআন ও হাদীসে মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে যা কিছু এসেছে সেগুলো ইয়াওমুল আখিরাত তথা কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়নের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, বারযাখের অবস্থা, কিয়ামতের অবস্থা, এ দিবসের হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান, শাস্তি, শাফা'আত, মীযান, আমলনামা, ডান ও বাম হাতে আমলনামা গ্রহণ, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা, জান্নাতী ও জাহান্নামীদের বর্ণনা, আল্লাহ উভয় দলের জন্য যেসব নি'আমত ও আযাব তৈরি করে রেখেছেন সেগুলোর সংক্ষিপ্ত ও বিশদ বর্ণনা ইত্যাদি পরকালের প্রতি ঈমানের শামিল।

চতুর্থ উসূল: ঈমান সম্পর্কে মাসআলা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে, কুরআন ও হাদীসে ঈমান সম্পর্কে যা এসেছে তা হলো, অন্তরের স্বীকৃতি যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বহিঃপ্রকাশ হয় তাই ঈমান। তারা বলেন, অন্তরের বিশ্বাস ও কাজ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা তা সম্পাদন ও মুখে উচ্চারণকে ঈমান বলে। এ তিনটি কাজই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে তা পরিপূর্ণ করবে সে ব্যক্তি ঈমান পূর্ণ করল, আর যে ব্যক্তি এর কোন কিছুতে ত্রুটি করল সে তার ঈমানে অপূর্ণ থাকল।

ঈমানের সত্তরেরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর সর্বোচ্চ শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস তুলে ফেলা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ।

এ মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে তারা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আম) মানুষকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। তারা হলেন, মুকাররাবূন তথা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তরা, ডানপন্থী ও দীন ও ঈমানের অবস্থা ভেদে যালিমগণ। ঈমান বাড়ে ও কমে। যে ব্যক্তি হারাম কাজ করে বা ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেয় তার তাওবা না করা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ঈমান কমে যায়।

এ উসূলের ওপর ভিত্তি করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আম মানুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তারা হলেন, যে ব্যক্তি ঈমানের হক পুরোপুরি আদায় করেছে সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন। আর যে ব্যক্তি ঈমানের হক পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে সে কাফির। আর তৃতীয় প্রকার হলো, যে ব্যক্তির মধ্যে ঈমান ও কুফুরী, ঈমান ও নিফাক, ভালো-মন্দ উভয়ই বিদ্যমান। তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অভিভাবকত্ব এবং এ কারণে সে তার ঈমান অনুযায়ী সম্মানিত হবে। আবার তার জন্য আল্লাহর ক্রোধও রয়েছে, তাই তার ঈমানের দুর্বলতা ও ঈমানের চাহিদা হারানোর কারণে সে আল্লাহর আযাব ভোগ করবে।

এ কথার ওপর ভিত্তি করে তারা (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আম) বলেন যে, কবীরা গুনাহকারী ও সগীরা গুনাহকারী কুফুরীর স্তরে পৌঁছে না, তবে তাদের মধ্যে ঈমানের কমতি দেখা দেয়, কিন্তু এ কারণে তারা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে না এবং তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামীও হবেন না। তাদের ব্যাপারে কাফির শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, যেমন খাওয়ারিজরা করে থাকেন অথবা তাদেরকে ঈমানহারাও বলা যাবে না, যেমনটি 'মুতাজিলারা করে থাকেন; বরং তারা ঈমানের কারণে মুমিন আর কবীরা গুনাহের কারণে ফাসিক। অতএব, তাদের মধ্যে সাধারণ ঈমান বিদ্যমান। আর যার মধ্যে সাধারণ ঈমান বিদ্যমান

তাকে কাফির বলা যাবে না। যখন আপনি এ উসূলটি এভাবে জানবেন তখন আপনার কুরআন ও সুন্নাহের উপর পুরোপুরি ঈমান অর্জিত হবে।

এ উসূলের ভিত্তিতে বলা হয় যে, ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে পূর্বের সব গুনাহ মোচন হয়ে যায়, তাওবার কারণে পূর্বের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়, কেউ মুরতাদ হলে তার সব আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি তাওবা করে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।

এ উসূলের ভিত্তিতে তারা ঈমানের ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ বলাও সহীহ মনে করেন। তারা বলেন, 'আমি মুমিন ইনশাআল্লাহ' বলা বৈধ। কেননা এর দ্বারা সে আল্লাহর পক্ষ্য থেকে ঈমান পরিপূর্ণ হওয়া আশা করেন। তাই সে ইনশাআল্লাহ বলেছে। আবার, মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানে ওপর অটল থাকার আশা করেছে, তাই সে মূল ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ ছাড়াই এভাবে ইনশাআল্লাহ বলেছে।

এ উসূলের ওপর ভিত্তি করে তারা বলে থাকেন যে, কাউকে ভালোবাসা ও ঘৃণা করার ভিত্তি ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় প্রকৃতপক্ষে ঈমান থাকা ও না থাকা এবং পরিপূর্ণ হওয়া বা অপরিপূর্ণ থাকা অনুসারে। অতঃপর, এ অনুযায়ী বন্ধুত্ব ও শত্রুতার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এ কারণেই ঈমানের অঙ্গ হলো, কাউকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আবার কারো সাথে আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করা, বন্ধুত্ব শুধু আল্লাহর জন্য এবং শত্রুতাও একমাত্র তার জন্যই। কেউ নিজের জন্য যা ভালোবাসে তা তার অন্য ভাইয়ের জন্যও ভালো না বাসলে তার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না।

এ উসূলের ওপর ভিত্তি করে আরও বর্তাতে, মুমিনদের মাঝে ভালোবাসা, তাদের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করতে উৎসাহিত করা এবং পরস্পরে বিছিন্ন না হওয়া ইত্যাদি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরস্পর পক্ষপাতিত্ব, নানা দলে বিভক্ত ও একে অপরকে হিংসা-বিদ্বেষ করা

থেকে মুক্ত। তারা এ ভিত্তিকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ উসূল মনে করেন। যে সব মাসআলায় বিভেদের কারণে বিদ'আত ও কুফুরীর দরজায় পৌঁছায় না সে সব মাস'আলার ব্যাপারে তারা মতানৈক্য করা সমীচীন মনে করেন না।

ঈমানের উসূলের ওপর আরও শামিল করবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের স্তর অনুসারে তাদেরকে ভালোবাসা, তাদের আগে ও পরে ইসলাম গ্রহণ অনুযায়ী সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে যা সমস্ত উম্মাতের ঊর্ধ্বে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সাহাবীদের ভালোবাসা সংরক্ষণ করেন ও তা প্রচার করেন; তাদের মধ্যকার ভুল বুঝা-বুঝির ব্যাপারে সমালোচনা থেকে বিরত থাকে। তারা বিশ্বাস করেন যে, সাহাবীগণ সমস্ত উত্তম গুণে গুণান্বিত ও উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, সব কল্যাণ কাজে তারা অগ্রগামী ও অসৎ কাজ থেকে তারা সবচেয়ে দূরবর্তী। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আরও বিশ্বাস করেন যে, উম্মতের দীন ও দুনিয়ার সংশোধন ও পরিচালনার জন্য একজন ইমামের প্রয়োজন, তিনি তাদের থেকে সীমা-লঙ্ঘনকারীদেরকে প্রতিহত করবেন, আর আল্লাহর নাফরমানি বাদে ভালো কাজে ইমামের আনুগত্য ছাড়া ইমামত পরিপূর্ণ হয় না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে, সাধ্যানুযায়ী শক্তি, মুখের ভাষা ও অন্তরের দ্বারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। সর্বোপরি, তারা মনে করেন, শরী'আতের উসূলসমূহ শর'ঈ পদ্ধতিতে পালন করাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা।

পঞ্চম উসূল: ইলম ও আমলের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পদ্ধতি

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত দৃঢ় বিশ্বাস করেন ও জানেন যে, উপকারী ইলম ও সৎ আমল ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও তাঁর পক্ষ থেকে পুরস্কার লাভ করা বিকল্প কোন পথ নেই।

ইলমে নাফে‘ তথা উপকারী ইলম হলো: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন ও সুন্নাহ-এর যেসব ইলম নিয়ে এসেছেন সেগুলোই ইলমে নাফে‘ তথা উপকারী ইলম। তারা কুরআনের অর্থ জানা, এর উসূল ও ফুরু‘ (মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা) অনুধাবন করা, তারা শব্দের দালালাতুল মুতাবিকা[1], দালালাতুত তাদাম্মুন[2], দালালাতুল ইলতিযাম[3] অনুযায়ী সব পদ্ধতিতে কুরআন ও হাদীসের অর্থ গ্রহণ করে। আল্লাহ তাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছেন সে জ্ঞানানুযায়ী তারা এসব কিছু জানতে ও অনুধাবন করতে চেষ্টা করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, এসব কিছু ইলমে নাফ‘ তথা উপকারী ইলম। এগুলো এবং এগুলোর সহযোগী সব ইলমসমূহও শর‘ঈ ইলম। আর প্রত্যেক ক্ষতিকর বা এসব ইলমের বিপরীত ইলম হলো বাতিল ইলম। এটি হলো তাদের ইলমের পদ্ধতি।

---

[1] শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে সে অর্থের উপর পুরোপুরি বুঝালে তাকে দালালাতুল মুতাবিকা বলে। যেমন, (الخالق) সৃষ্টিকারী শব্দটি আল্লাহর যাত ও সৃষ্টির গুণের উপর বুঝানো, (الدار) ঘর শব্দ দ্বারা ঘরের সম্পূর্ণ অংশ বুঝানো।

[2] শব্দকে যে অর্থে গঠন করা হয়েছে সে অর্থের আংশিক উদ্দেশ্য হলে তাকে দালালাতুত তাদাম্মুন বলে। যেমন, (الخالق) সৃষ্টিকারী শব্দটি শুধু আল্লাহর যাত অথবা শুধু সৃষ্টির গুণের উপর আলাদাভাবে বুঝানো।

[3] শব্দকে যে উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে সে অর্থে না বুঝিয়ে তার অত্যাবশ্যকীয় অর্থে বুঝালে তাকে দালালাতুল ইলতিযাম বলে। যেমন, (الخالق) সৃষ্টিকারী শব্দটি আল্লাহর যাত বা সৃষ্টির গুণের উপর না বুঝিয়ে ইলম ও কুদরাতের উপর বুঝানো।
দালালাতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেত আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন, আত-তা‘রিফাত, জুরজানী, পৃষ্ঠা ১১০, তিনি এর উদাহরণ (الإنسان) তথা মানুষ দিয়ে দিয়েছেন। এ শব্দটি কথা বলতে সক্ষম প্রাণী তথা মানুষের ওপর পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়, আবার এর আংশিক অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং ইলম গ্রহণ করার ক্ষমতার অর্থে অত্যাবশ্যকীয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

আর তাদের আমলের পদ্ধতি হলো: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত আল্লাহর ওপর বিশ্বাস, পূর্ণ স্বীকৃতি ও মজবুত ঈমানের মাধ্যমে নৈকট্য তালাশ করে, যে ঈমান ইবাদতের মূল ও এর ভিত্তি। এ ব্যাপারে কোনো ধরণের দ্বিধা সংশয় থাকে না। অতঃপর তারা আল্লাহর হক ও সৃষ্টিকুলের হক সম্পর্কিত ফরয আদায়, বেশি বেশি নফল আদায়, সৃষ্টিকুলের প্রতি নানা ভাবে দয়া প্রদর্শন, হারাম কাজ বর্জন ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন। তারা দৃঢ়ভাবে জানেন যে, আল্লাহ একনিষ্ঠার সাথে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর নবীর সুন্নাত অনুযায়ী কাজ না করলে তা কবুল করেন না।

তারা উপকারী ইলম ও সৎ আমল যা দুনিয়া ও আখিরাতের সব ধরণের কল্যাণ ও সফলতায় পৌঁছায়, এসবের দ্বারা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।

এ বড় উসূলগুলোই হলো মূল উসূল, এ উসূলের মধ্যেই উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া হয়েছে ও মূল পয়েন্টগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এর চেয়ে বেশি বিস্তারিত আলোচনা ও দলীলসহ উল্লেখ করলে এ সম্পর্কে আরও বিস্তর আলোচনা করা দরকার হবে এবং বড় কিতাব লিখতে হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীদের ওপর।

প্রশ্ন: ইবাদাতের হাকীকত ও সারাংশ যেহেতু সর্বোচ্চ ভালোবাসা ও সর্বোচ্চ বিনয়ী হওয়ার ওপর নির্ভর করে, কিন্তু দেখা যায়, সৃষ্টিকুল সৃষ্টিকুলকে পরস্পর ভালোবাসে ও একে অন্যের সামনে নত হয় অথবা একতরফা ভালোবাসে বা বিনয়ী হয়, তাহলে উপরোক্ত দু’টি উসূলের ভিত্তিতে সৃষ্টিকুলের সাথে সম্পৃক্ত ভালোবাসা ও বিনয় যা ইবাদতের স্তরে পৌঁছে না ও ইবাদতের হাকীকতের মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: (আল্লাহই একমাত্র তাওফীকদাতা, তাঁর ওপরই তাওয়াক্কুল করছি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবো)। জেনে রাখুন, এ প্রশ্নটি একটি বড় প্রশ্ন ও অতি গুরুত্বপূর্ণ। ইবাদাতের গুরু রহস্য ও হাকীকত এমনকি পুরো তাওহীদই ভালোবাসা ও বিনয় সম্পর্কে জানার ওপর নির্ভরশীল। কোন ভালোবাসা ও বিনয় ইবাদত আর কোনটি ইবাদত নয় ও এ দু'টি বিষয়ের পার্থক্য জানা, কেননা এ দু'টির পার্থক্য পরস্পর বিপরীতমুখী, যদিও শব্দ দু'টি দেখতে কাছাকাছি, তবে এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

এর বিস্তারিত বর্ণনা হলো, আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর কাছে নত হওয়ার প্রকৃত অর্থ হলো, তাঁর শরী'আতের সমস্ত সংবাদ সত্যায়ন করে আত্মসমর্পণ করা। এ সত্যায়নের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য তালাশ করা, যা অন্তরের জন্য ইলম ও উপকারী জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত হয়, এটি ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ লক্ষ্যে ও সর্বাধিক উদ্দেশ্যে পৌঁছায়। আল্লাহর নৈকট্য, তাঁর সন্তুষ্টি, দুনিয়া ও আখিরাতের সাওয়াবের প্রত্যাশায় তাঁর আদেশ মান্য করা ও নিষেধ থেকে বিরত থাকা। অতএব, আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রচেষ্টা করাই প্রকৃত ভালোবাসা; বরং এটি সমস্ত ভালোবাসার সারাংশ। কেননা আবেদ তথা গোলাম হলো যখন তার রব তথা মালিককে ভালোবাসে তখন সমস্ত পন্থায় তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে ও তাঁর নিকটবর্তী হতে চায়। আর এ প্রচেষ্টা ও কাজই হলো প্রকৃত আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ, যা রবের সমীপে নত হওয়া ও তাঁকে সম্মান করার সারাংশ; বরং এটিই হলো মুমিনের আত্মিক শক্তি যার ওপর ভিত্তি করে সে দৃঢ় সংকল্প করে থাকে। আর তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনিত সমস্ত সংবাদের উপর সাধারণভাবে বিশ্বাস আনায়ন করে তাদের আনুগত্য করা, তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা। আর এটিই হলো প্রকৃত ভালোবাসা ও অপমান হওয়া। যেহেতু মুমিন বলে: (سمعنا وأطعنا) আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। অতএব, দীনের যা কিছুই তারা করে থাকে, দীনের যে সব কাজ

করার দৃঢ় প্রত্যায় করে থাকে এবং যা কিছু অত্যাবশ্যকীয়ভাবে নিয়মিত করার সিদ্ধান্ত নেয় সব কিছুই ভালোবাসা ও অপমান বোধের কারণেই হয়ে থাকে। এটিই হচ্ছে ইবাদতের প্রকৃত প্রভাব। আর এর ফলাফল হলো, ইলম, প্রত্যয়, আমল ও নিয়তে দীনের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা।

আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর সিফাতসমূহ জানার মাধ্যমে এ ভালোবাসা ও অপমান বোধ সৃষ্টি হয়। কেননা আল্লাহর রয়েছে পূর্ণমর্যাদাময় নামসমূহ ও মহান সিফাতসমূহ যা সমস্ত গুণে পরিপূর্ণ ও সর্বোচ্চ মহত্ব ও সৌন্দর্যে ভরপুর। এগুলো হলো সিফাতুল ইলাহিয়্যাত ও তাঁর গুণাবলী। অতএব, আল্লাহই হচ্ছেন ভালোবাসা ও নত হওয়ার মূল উৎস। যেহেতু তাঁর রয়েছে সর্বোচ্চ পরিপূর্ণ গুণাবলী, যা তাঁর জন্যই নির্ধারিত, কেউ এসব গুণে অংশীদার নয়। কুরআন ও তাঁর রাসূলগনের ভাষায় তাঁর যেসব গুণাবলী ও প্রশংসা উল্লেখ হয়েছে সেগুলোই সিফাতুল উলুহিয়্যাত, এসব গুণাবলীর কারণে বিনয়ী প্রেমিকরা তাঁকে ইলাহের আসনে বসায় (ইলাহ হিসেবে মানে) এবং এ কারণেই তারা তাঁর ইবাদাত করে। তাই তারা তাঁর বড়ত্ব, ক্ষমতা, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানে, ফলে তাঁর কাছে নত হয় ও নিজেকে অপমানিত ও নগণ্য মনে করে। আবার যখন তাঁর পরিপূর্ণতা, দানশীলতা, দয়া, বদান্যতা, ইহসান ইত্যাদি জানে তখন তাদের হৃদয় তাঁর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তাদের মুখ তাঁর প্রশংসায় ভরে যায়, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর নৈকট্য লাভ, সন্তুষ্টি অর্জন ও সাওয়াবের প্রত্যাশায় অনুগত হয়ে যায়। তারা আল্লাহর ন্যায় বিচার, প্রজ্ঞা, সব কিছু যথাস্থানে স্থাপন করার নিপুণতা, তাঁর বিরোধীদেরকে নানা রকমের শাস্তি প্রদান ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে তাঁকে ভয় করে, তাঁর অবাধ্যতা থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে ও বিরত থাকে। ভুলবশত অবাধ্যতায় পতিত হলেও তাড়াতাড়ি তাওবা করে এবং এর থেকে বেরিয়ে আসে। মুমিনরা আল্লাহর অপরিসীম দয়া, অফুরন্ত রহমত, নানা ধরণের কোমতলা জানে, ফলে তারা তাঁর দয়া

লাভে আগ্রহী হয়, তাঁর সাওয়াব ও বদান্যতা অর্জনের চেষ্টা করে, তখন তাদের কাছে কষ্টের কাজও হালকা মনে হয় যখন তারা ভাবে যে, এর বিনিময়ে তাদেরকে সম্মানিত করে হবে এবং সর্বোচ্চ সাওয়াব দান করা হবে। মুমিনরা জানে যে, আল্লাহ ছাড়া কারো থেকে কল্যাণ আসতে পারে না, আবার তিনি ছাড়া কেউ কোনো ক্ষতিও করতে পারে না, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরণের নি'আমত একমাত্র তাঁর পক্ষ থেকেকেই, আর সব অকল্যাণ ও শাস্তি ব্যক্তির কর্মের কারণেই, তিনিই প্রকৃত ও একমাত্র রব আর তারা সবাই তাঁর প্রকৃত গোলাম। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন কিছু আবিষ্কার, সম্প্রসারণ ও সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়, তাঁর সৃষ্টি সব ফরিকগণ (সব সৃষ্টি) সব কাজেই তাঁর কাছে সাহায্য চায়, তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় কাজে-কর্মে, তাদের রিযিক ও পরিচালনা কাজে। তারা আসলেই একমাত্র আল্লাহর দাস, তিনি ছাড়া তাদের কেউ সাহায্যকারী নেই, কিন্তু তাদের কাছে আল্লাহ বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষী নন; বরং কল্যাণ বা অকল্যাণ যা কিছুই সংঘটিত হয় সব কিছুই একমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই। ফলে তারা যখন তাদের রবকে জানতে পারে তখন তারা নিজেরাও নিজেদের আসল পরিচয় জানতে পারে, তখন তারা নিজেদেরকে আল্লাহর সামনে অপদস্ত, অপমানিত ও বিনীত মনে করেন এবং যেসব কাজে তাঁর নৈকট্য লাভ করা যায় সেসব কাজ করতে তারা পাগলপারা (আগ্রহী) হয়ে যায়। যখনই রহমতের প্রয়োজন পরে তখনই তারা তাঁর কাছে রহমত প্রার্থনা করে, তিনি তাদেরকে রহমত করেন, তাদের মা'বুদ সর্বক্ষণই অভাবীর ডাকে সাড়া দেন ও তাদেরকে সাহায্য করেন। অতএব, উপরোক্ত আলোচনার থেকে স্পষ্ট হলো যে, ভালোবাসা ও অপমানবোধ মূলত আল্লাহর ইবাদত এবং তাকে ইলাহ হিসেবে মেনে নেওয়া, কাউকে তাঁর অনুরূপ না বানানো, উপকরণ ও দায়-দায়িত্বে অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ না বানানো। দীনের কাজ-কর্ম পালনই হলো প্রকৃত ভালোবাসা ও বিনয়। আল্লাহর পরিচয়

জানা, তাঁর যেসব মহত্ব, বড়ত্ব ও একত্ব রয়েছে সেগুলো জানা, বান্দা নিজের পরিচয় জানা, সে যে রবের বন্দেগীতে শুধুই মাত্র দাস ও তাঁরই কাছে অসহয় অভাবী তা জানা, ইলাহের কাছে তার প্রয়োজন, তার সুখ-সৌভাগ্য তাঁরই উপর নির্ভরশীল, তিনি এ ইবাদতের একমাত্র যোগ্য বান্দার এটি জানা, কেননা তারা তো আল্লাহরই দাস এবং তাঁরই ইবাদত করতে আদিষ্ট ইত্যাদি জানা প্রকৃত ভালোবাসা ও বিনয়। মাবুদ যেহেতু সর্ব গুণে ও পূর্ণতায় পরিপূর্ণ, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, সেহেতু ইবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত, কেউ এতে অংশিদার হবে না। বান্দার মাঝে এ বিশ্বাস যত বেশি শক্তিশালী হবে তার তাওহীদও তত বেশি পরিপূর্ণ হবে এবং আল্লাহর ইবাদতও তত বেশি পূর্ণাঙ্গ হবে। আক্বীদা, কথা ও কাজে আল্লাহর ইখলাস, আল্লাহর পরিচিতি সংক্ষিপ্ত, বিস্তারিত, মৌলিক ও আনুসঙ্গিক রূপে জানার মাধ্যমে তাওহীদ পরিপূর্ণ হয়। আর এসব বিষয়ের জ্ঞান যত দুর্বল হবে তার তাওহীদও তত দুর্বল হবে। এ কারণেই রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত, উবুদিয়্যাত, তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত ওয়াল আফ‘আল (আল্লাহর নামসমূহ, সিফাতসমূহ ও কাজসমূহ) এ শির্ক সর্বদাই ইবাদতের বিপরীত যা সর্বোৎকৃষ্ট ভালোবাসা ও অবনত হওয়া। কেননা যে ব্যক্তি ধারণা করে যে এ মহাবিশ্ব প্রতিপালন ও পরিচালনায় আল্লাহর সাথে কেউ শরীক আছে, অথবা আল্লাহর পরিপূর্ণ গুণাবলীতে তাঁর সমকক্ষ বা অনুরূপ কেউ আছে তাহলে সে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শির্ক করল এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ করল; বরং সৃষ্টিকুলকে স্রষ্টার সাথে, দাস ও পরিচালিতকে মালিক ও পরিচালকের সাথে সমান করল এবং আল্লাহর উলুহিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যসমূহকে নেতিবাচক করল যা প্রকৃতপক্ষে একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত। যে ব্যক্তি উবুদিয়্যাত ও ইখলাসে শির্ক করল অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করল সে তার তাওহীদ অপূর্ণাঙ্গ করল ও তার দীন বিনষ্ট করল যা শুধুই একনিষ্ঠতা ও ইখলাস। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُ﴾ [الزمر: ٣]

“জেনে রেখ, আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদাত-আনুগত্য।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩] তাহলে কোন ভালোবাসা ও কোন বিনীত হওয়া এ ইখলাসের সমান বা কাছাকাছি? হ্যাঁ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে এ ধরণের ভালোবাসা ও তার সামনে এ ধরণের বিনয় হচ্ছে ইবাদতের সমপর্যয় আর এটি করা শির্ক। এ ধরণের ভালোবাসাই মুশরিককের থেকে প্রকাশ পায় যারা তাদের প্রতিমাগুলোকে বিনয়, সম্মান ও ভালোবাসা প্রদর্শনে মহাবিশ্বের রব রাব্বুল আলামীনের সমান মনে করে। এ কারণেই জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভীষণ অনুতপ্ত হয়ে বলতে থাকবে যে, তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত ছিলো। তাদের ভাষায়ই শুনুন,

﴿تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ٩٧ إِذۡ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٨﴾ [الشعراء : ٩٧، ٩٨]

“আল্লাহর কসম! আমরা তো সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে সকল সৃষ্টির রবের সমকক্ষ বানাতাম।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ৯৭-৯৮]

অথচ এটি তাদের তাওহীদে শির্ক, কেননা তারা রবের ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনে মুমিনদের মত ছিলো না। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادٗا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِۗ ١٦٥﴾ [البقرة: ١٦٥]

আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালবাসার মতো ভালবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় দৃঢ়তর। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৫]

অতএব, এ আলোচনা থেকে ইবাদতের হাকীকত তথা মূল স্পষ্ট হলো যে, ইবাদতে ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন আর স্বভাবজাত ও আনুসঙ্গিক

ভালোবাসার মধ্যে বিশাল পার্থক্য। স্বভাবজাত ভালোবাসা কোন জিনিসের গুণ ও উক্ত জিনিসের প্রতি আকর্ষণের কারণে হয়, উক্ত গুণ বা আকর্ষণ অবশিষ্ট থাকলে সে জিনিসের প্রতি ভালোবাসা থাকে আর গুণ বা আকর্ষণ চলে গেলে তার প্রতি আর ভালোবাসা থাকে না। অন্যদিকে স্বভাবজাত বিনয় সৃষ্টিকুলের কারো শাস্তির ভয়ে হতে পারে যে নিজেরই কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। এ দু'টি ব্যাপার কখনও সৃষ্টির মাঝে একত্রিত হতে পারে, ফলে সে কাউকে ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করতে পারে বা তার কাছে বিনয়ীও হতে পারে। যেমন, সে পিতার অধিকার বা ইহসান ইত্যাদি লক্ষ্য করে তখন তাকে ভালোবাসে ও তার প্রতি বিনয়ী হয়। যেহেতু পিতার অবদান ও তার অধিকার সে জানে বলে তাকে সম্মান ও ভালোবাসে, অথচ সে ভালো করেই জানে যে, তিনি (পিতা) তারই মতো একজন সৃষ্টজীব, তারই মতো অসম্পূর্ণ, তারই মতো সর্বক্ষেত্রে অভাবী, সে কোনো উপকার বা ক্ষতি, জীবন-মৃত্যু দান ও পুনরুত্থান করতে পারে না (এ সত্ত্বেও তাকে ভালোবাসে ও সম্মান করে)। অন্যদিকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নির্বাচিত লোকদের (নবী-রাসূল) প্রতি ভালোবাসা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ভালোবাসা কারণেই সৃষ্টি হয়। কেননা তাদের মধ্যে যখন তাদের প্রেমিকের (আল্লাহ) ভালোবাসা দেখে, যেহেতু আল্লাহ যেসব কাজ করলে সন্তুষ্ট তারা সেসব কাজ করে, ফলে তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে ভালোবাসেন। এ কারণেই উবুদিয়্যাত ও তাওহীদের শক্তির কারণে এ ধরণের ভালোবাসা শক্তিশালী ও মজবুত হয়।

হে আল্লাহ! আপনার কাছে প্রার্থনা আপনি আমাদেরকে আপনার ভালোবাসা, যে আপনাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসা এবং যে আমল আপনার ভালোবাসায় পৌঁছায় সে আমলের ভালোবাসা দান করুন। আমরা আপনার দয়ার উসিলায় আপনার কাছে পানাহ চাই আপনার ভালোবাসার সাথে মাখলুকের ভালোবাসার শির্ক থেকে, আপনার সাথে যে সব বিষয় নির্দিষ্ট সেসব

বিষয়ে অন্যের সাথে সমকক্ষ করার শির্ক থেকে এবং আপনি যেসব ব্যাপারে একক ও একচ্ছত্র সেসব ব্যাপারে শির্ক করা থেকে। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে আরও প্রার্থনা করি আমাদের শক্তি-সামর্থ্য, সুস্থতা, আরোগ্যতা, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধন সব কিছু আপনার ভালোবাসার সাহায্যকারী ও আপনার আনুগত্যের কাজে শক্তি হিসেবে কবূল করুন। আপনি আমাদেরকে সব কাজে পূর্ণ ইখলাস দান করুন, যাতে ইবাদত ও অন্যান্য কাজে-কর্মে আমাদের নিয়ত ও প্রচেষ্টা আপনার কাছে পৌঁছায়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে খারাপ কাজ ও পাপ আমল থেকে রক্ষা করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদানশীল ও পরম দয়ালু।

সমাপ্ত